বিশেষ সংখ্যা

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

৩য় বর্ষ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা । সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

প্রতিষ্ঠা

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধায়ক

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের

প্রধান সম্পাদক

মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক

উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক

বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক

কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনায়

আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী, মুফতী ইমদাদুল্লাহ,
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী, আনিসুর রহমান আফিফি,
মুফতী মাসউদ আলিমী, মুহা. সায়েম আহমাদ,
মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ, মুহা. হাছিব আর রহমান,
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন,
শামসুল আরেফিন, তাশরীফ আহমদ,
জাবের মাহমুদ, মাও. হাবিব উল্লাহ,
জুবায়ের আহমেদ, মুফতী সাইফুল্লাহ,
হুসাইন আহমদ, মুহা. আব্দুর রশীদ।

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

৩য় বর্ষ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-২০২৪

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে **নবীনকণ্ঠ** এবারের আয়োজন **২৪'র গণঅভ্যুত্থান** সংখ্যায় যারা লিখেছেন;

লেখক সূচি

প্রবন্ধ

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন
হুসাইন আহমদ
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের
রাইহান উদ্দিন
মো. তাসনীম হোসেন
মাহমুদ হাসান ফাহিম
মাসুম আলভী

স্মৃতিচারণ

বিন ইয়মিন সানিম
যাইদ আল মারুফ মাসুদ

স্মৃতিগদ্য

ওমর ইবনে আখতার
ইরফান বিন আহমদ
উবাইদুল্লাহ তারানগরী

ফিচার

আমির হামজা বিন সাত্তার
বেলাল বিন জামাল
হাফিজ বিন ইসমাইল

গল্প

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মো. আশিকুল্লাহ মাহমুদ, আমাতুল্লাহ শারমিন

ছড়া/কবিতা

কাজী মারুফ, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, মাহদী হাসান ফরাজী, মেরাজুল ইসলাম, কালিমুল্লাহ বিন ইব্রাহীম, সোলায়মান হোসেন সুমন, আতাউর মালেক, শরিফ আহমাদ, মোহাম্মাদ আফজাল হোসেন মাসুম, মুহা. মুকুল মিয়া, জুনাইল বাশার, ইবনে সিরাজ, শারমিন নাহার ঝর্ণা, মোহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম, জিয়া হক।

রোজনামচা

তৌহিদুর রহমান

নবীন কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে ...

বাংলাভাষী পাঠকদের প্রিয় কাগজ 'নবীনকণ্ঠ'র এবারের আয়োজন ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের হালচাল। এই সংখ্যার প্রতিটি লেখায় রক্তাক্ত জুলাইয়ের আঁচড় দেখতে পাবেন। প্রতিটি পাতায় বাংলার সাহসী ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ছাত্র-জনতার এই অকল্পনীয় বিজয় আজ শুধু ৫৬ হাজার বর্গমাইলেই সীমাবদ্ধ নয়; এই বিজয়ের পরিধি ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর বহু মুক্তিকামী মজলুম বনি আদমের কাছে।

ইতিহাসের ১৩৮৪ বছর পেছনে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাই-পৃথিবী বিখ্যাত সম্রাট রুস্তমের সাথে কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের কথা শুনে উমর রা. মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সিজদায় যেভাবে ডুকরে কেঁদেছিলেন, স্বৈরাচারী হাসিনার পতনের পর একইভাবে সিজদায় ডুকরে কেঁদেছিলেন বাংলার হাজারো কোটি মানুষ। এ যেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

এই বিজয় মহান আল্লাহ অশেষ দান। আমাদের সামান্য চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে তিনি কবুল করেছেন। এজন্য সর্বদা আল্লাহর প্রতি শোকর-জিকির জারি রাখতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ফিলিস্তিন-কাশ্মীর আমাদের চেয়ে হাজারো গুণ বেশি নির্যাতিত-নিষ্পেষিত। শহিদের মিছিলেরও অন্ত নেই। অথচ আমরা আল্লাহর খাস রহমতে মাত্র ১৬ বছরের মধ্যে বিজয় পেয়েছি।

তাই বিশ্বমানবতার জন্য আমাদের স্বাধীনতা ২.০ ধরে রাখতে হবে। কারণ, আমাদের আগে শ্রীলঙ্কা স্বৈরাচারমুক্ত হলেও তাদের দেশের সংস্কার হয়নি, ফলে সেই জায়গায় বাংলাদেশ অনন্য! তাই দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ নিয়ে যে আশা জাগরূক হয়েছে, আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় সুন্দর একটি দেশ বিনির্মাণের মাধ্যমেই সেই আশার বাস্তবায়ন করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রধান সম্পাদক

জুলুম শব্দের শাব্দিক অর্থ অত্যাচার, অভিচার, নির্যাতন। মানবিক বিবেচনায় যেমন এটি অনেক বড় ধরনের অন্যায় ও পাপ, ঠিক তেমনিভাবে শরিয়তের দৃষ্টিতেও তা অনেক বড় অপরাধ। যে জুলুম করে, তাকে জালেম বলে। জুলুম করার পরিণতি দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতেই ভোগ করতে হয়। জুলুম শুধু অন্যের হক নষ্ট করার নাম নয়। বরং কখনো আল্লাহর হক নষ্ট করা ও নিজের হক নষ্ট করাও জুলুমের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো বস্তুকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় না রেখে অন্য জায়গায় রাখা। সার কথা হলো, কারও প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করাই জুলুম। ফলে জুলুম শব্দের অর্থের অনেক ব্যাপকতা পাওয়া যায়। চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুস, টাকা-পয়সা আত্মসাৎ, লুটতরাজ, গালিগালাজ, অন্যায়, অবিচার, মারামারি, অবৈধ লেনদেন, ধোঁকা, কারও অধিকার হরণ ইত্যাদি জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়া, আল্লাহর সাথে শিরক করা, মিথ্যাচার করাও অনেক বড় ধরনের জুলুম। কুরআন ও হাদিসে অনেক প্রকার জুলুমের ভয়াবহতা ও শাস্তি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে আল কুরআনের আলোকে জুলুমের প্রকার ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে তুলে ধরা হলো।

সবচেয়ে বড় জুলুম হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং এই জুলুমের অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

বাছা, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড় জুলুম -সূরা লুকমান (৩১) : ১৩

আল্লাহ তাআলা বলেন,

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। -সুরা নিসা (৪) : ৪৮

বান্দার কোনো হক নষ্ট করলে জুলুম হয়। আবার নিজে কোনো গুনাহে লিপ্ত হলে বা অপরাধে জড়িত হলেও তা জুলুম হয়। যেমনঃ আল্লাহ বলেন,

কেউ আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমারেখা লঙ্ঘন করলে, সে তো তার নিজের উপরই জুলুম করল। - সূরা ত্বলাক (৬৫) : ১

আল্লাহ আরও বলেন,

যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি জুলুম করে বসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে অবশ্যই আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পাবে। -সূরা নিসা (৪) : ১১০

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৫

এছাড়া শরিয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে তাও জুলুম হিসেবে গণ্য হয়। **যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,**

এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। সুতরাং তোমরা এসব লঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে তারা বড়ই জালিম। -সূরা বাকারা (২) : ২২৯

এছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলা অনেক বড় জুলুম। **যেমন আল্লাহ বলেন,**

ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? বিশ্বাস কর, অপরাধীরা কৃতকার্য হয় না। -সূরা ইউনুস (১০) : ১৭

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, *তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা যখন তার কাছে সত্য বাণী পৌঁছে, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে? (এরূপ) কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়? -সূরা আনকাবূত (২৯) : ৬৮*

অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া বা কারও হক নষ্ট করা ভয়াবহ জুলুম। **আল্লাহ বলেন,**

যারা নিজেদের উপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। -সূরা শূরা (৪২) : ৪১-৪২

দ্বিনি কাজে বাধা দেওয়াও জুলুম। **আল্লাহ বলেন,**

সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম নিতে বাধা প্রদান করে এবং তাকে বিরান করার চেষ্টা করে? এরূপ লোকের তো ভীত-বিহ্বল না হয়ে তাতে প্রবেশ করাই সঙ্গত নয়। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে মহা শাস্তি। -সূরা বাকারা (২) : ১১৪

শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ধর্ম সর্বপ্রকার জুলুম বা অত্যাচার কঠোরভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জুলুম করা যেমন গুনাহ, জালিমকে সহযোগিতা করা, তার সাথে সম্পর্ক রাখা, তাকে সাপোর্ট করাও জুলুম। সেও জালিম হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এর পরিণতি অনেক ভয়াবহ। দুনিয়া আখেরাতে জুলুমের পরিণতি ভোগ করতে হয়। এজন্য আমাদের সবাইকে সর্বপ্রকারের জুলুম থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জুলুম করা থেকে হেফাজতে রাখুন। জালিমের জুলুম থেকেও হেফাজত করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

লেখক, মুফতী ওয়ালিউল্লাহ তাহসিন

লেখক, গবেষক ও শিক্ষক

নির্যাতনকারীদের আল্লাহ ছেড়ে দেন না

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানি

নমরুদ, ফেরাউনের অত্যাচার-নির্যাতনের করুণ ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্ববাসী অবহিত আছে। অবহিত আছে আবু জেহেল, আবু লাহাব ও এজিদের নির্মমতা সম্পর্কে। তারা কেউ আজ পৃথিবীতে নেই। সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে তাদের চিরবিদায় হয়েছে।

রয়ে গেছে বিশ্ববাসীর অন্তরে তাদের কালো ইতিহাস। আল্লাহতায়ালা ছাড় দেন। কিন্তু ছেড়ে দেন না। এসব ইতিহাস সর্বকালের অহংকারীদের জন্য শিক্ষণীয়, সতর্কবার্তা।

মহান প্রভু ঘোষণা করেন, 'নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার ধরা বড়ই কঠিন।' (সুরা বুরুজ-১২)।

ফেরাউন দাম্ভিকতার সীমা লঙ্ঘন করেছিল। সে নিজেকে বড় খোদা হিসেবে দাবি করেছিল।

আল্লাহতায়ালা ফেরাউনের পরিণতি অত্যাচারীদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কোরআনে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তার লাশটিও কোনো জড় ও জীব গ্রহণ করেনি। পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য রয়ে গেছে মিসরের পিরামিডে। 'এবং সে বলল, আমিই তোমাদের বড় পালনকর্তা। অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালে ও ইহকালে শাস্তি দিলেন।

যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।' (সুরা আন নাজিয়াত-২৪-২৬)।

বদরের প্রান্তে মক্কা নগরীর অত্যাচারী দাম্ভিকদের করুণ পরিণতি হয়েছিল। প্লেগ রোগের মাধ্যমে আবু লাহাবকে তিলে তিলে ধ্বংস করা হয়েছিল। অত্যাচার নির্যাতন করে পৃথিবীর কোনো দাম্ভিক পার পায়নি। আল্লাহতায়ালা জুলুম অত্যাচার সহ্য করেন না। মহান আল্লাহতায়ালা ফরমান, 'অত্যাচারীরা যা করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন ভাবিও না, আসলে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন, যেদিন সব চক্ষুস্থির (চূর্ণবিচূর্ণ) হয়ে যাবে।' (সুরা ইবরাহিম-৪২)। ইসলাম ধর্মে সব ধরনের অত্যাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অত্যাচারে সহযোগিতা, অত্যাচারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ অত্যাচার নির্যাতনে আনন্দ উল্লাস করা। ইসলামে পশু পাখি, গাছ-বৃক্ষ এবং যে

কোনো প্রাণের ওপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ-হারাম। হাদিসে কুদসিতে মহান প্রভু ঘোষণা করেন, 'হে আমার বান্দা! আমি নিজের ওপর জুলুম-অত্যাচার হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্য তা হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম-অত্যাচার কর না। ' (সহিহ মুসলিম, হা. ৬৭৩৭)।

জুলুম অত্যাচার একটি সামাজিক ব্যাধি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র এটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা যে কোনো পন্থায় অবিচার ও নির্যাতন করাকে জুলুম-অত্যাচার বলা হয়। মানুষের অধিকার হরণ করা ও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা বড় ধরনের জুলুম। জুলুম অত্যাচারের ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। ছিন্ন হয় সম্প্রীতির বন্ধন। নেমে আসে অভিশাপ ও অধঃপতন। অতএব প্রতিটি মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও অত্যাচার নির্যাতন নিজে পরিহার করা এবং অপরকে তা থেকে প্রতিহত করা সময়ের বড় দাবি।

'মহানবী (সা.) বলেন, অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক, তোমার মুসলিম ভাইকে সাহায্য কর। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসুল! আমি তো অত্যাচারীকে সাহায্য করব, অত্যাচারীকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত কর, এটাই অত্যাচারীর প্রতি তোমার সাহায্য। ' (সহিহ বুখারি, মুসলিম হা. ২৪৪৩)।

লেখক : গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা

ছাত্র-অভ্যুত্থানের জন্ম-মৃত্যু

মাসুম আলভী

রক্তক্ষয়ী এক ছাত্র-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে বাংলাদেশে। কোটা সংস্কারের দাবিতে তৈরি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, যা একসময় রূপ নেয় গণআন্দোলনে। বাংলাদেশ ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, পাঁচবার অভ্যুত্থান দেখেছে। কিন্তু এমন চিত্র অদ্বিতীয়। বুকের মধ্যে থাকা জগদ্দল পাথরের পালিয়ে যাওয়ার পর মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছে। প্রত্যেকটি আন্দোলনে উদ্দেশ্য থাকে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যও ছিল কোটার সংস্কার। অল্পদিনে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং গণদাবিতে পরিণত হয়। তবে সময় গড়াতেই মৃত্যুর মিছিল লম্বা হতে থাকে। আর আন্দোলনেও যুক্ত হতে থাকে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। কোটা সংস্কার থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের দাবি ওঠে।

কারণ মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, তার সব হারিয়েছে। মোটাদাগে যদি বলি, গণতন্ত্র, বাক্ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভোটাধিকার, শিক্ষা, আইনের শাসন, কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ, ঘুস-দুর্নীতি মুক্ত সোনার বাংলা। তারুণ্যের এই দ্বিতীয় বিজয়ের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে তো? গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনের সমন্বয়করা বিভক্ত না হয়ে হাতে হাত রেখে সব সময় কাজ করবে তো? কতশত প্রশ্ন, সংশয় আর শঙ্কা। তবুও আমার বিশ্বাস, তরুণরা বলে দেবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা।

আন্দোলনের শুরুর দিনগুলো ছিল অত্যন্ত বিভৎস ও বিপজ্জনক। রাস্তায় হুইসেল, সাইরেন, শটগান, ছররা, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল, রাবার বুলেটে তটস্থ সবাই। নিরপরাধ শিক্ষার্থীদের মেসগুলোতে ব্লক রেড দিয়ে মধ্যরাতে দরজায় বুটের খটখট শব্দ। দমন-পীড়ন, হামলা-মামলা, গুম-খুন, নির্যাতনের শিকার জনসাধারণ। ঢাকা মেডিকেলে আহতদের চিকিৎসার জন্য নেওয়া হলে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের ইন্ধন জোগায় অথর্ব মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। জাতিসংঘ, অ্যামিনেস্টি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ প্রকাশ করে দমন-পীড়ন বন্ধের আহ্বান জানায়। ছাত্রদের মিছিল, গণজমায়েত কারফিউর মাধ্যমে পদে পদে পুলিশ

বাহিনী ও দলের নেতাকর্মীরা বাধা সৃষ্টি করে। ছাত্র-জনতাও প্রচণ্ড বেপরোয়া হয়ে ওঠে। গভীর রাতে রাস্তা জনস্রোতে পরিণত হয়। 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার! এবং চাইতে গেলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার!' স্লোগানে রাজপথ মুখরিত হতে থাকে। বাংলা ব্লকেড কর্মসূচিতে রাজধানীর বিভিন্ন মোড় ও প্রবেশপথ, মহাসড়ক, রেলপথ শিক্ষার্থীরা অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। ক্যাম্পাসের আবাসিক হলগুলো থেকে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন মুক্ত ঘোষণা করে আনন্দ মিছিল করতে থাকে। আন্দোলন যখন পরিণত রূপ নেয়, তখন ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। পরে চালু করা হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে বিধিনিষেধ ও কঠোর নজরদারিতে রাখে।

সোমবার চূড়ান্ত আন্দোলন 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে সারা দেশে পাড়া, গ্রাম, উপজেলা, জেলায় ছাত্রদের নেতৃত্ব 'সংগ্রাম কমিটি' গঠন এবং ঢাকায় আসার আহ্বান করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। 'ছাড়তে হবে ক্ষমতা, ঢাকায় আসো জনতা' স্লোগানে সারা দেশের ছাত্র-জনতাকে শাহবাগে জমায়েতের ডাক দেয়। এক বিবৃতিতে অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'যদি ইন্টারনেট ক্র্যাকডাউন হয়, আমাদেরকে গুম, গ্রেপ্তার, খুনও করা হয়, যদি ঘোষণা করার কেউ নাও থাকে, এক দফা দাবিতে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত সবাই রাজপথ দখলে রাখবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন।' ঢাকা ও আশেপাশের জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে ঢাকা ঢুকতে থাকে। জনস্রোতে সেনাবাহিনী বাধার চেষ্টা করেও পরে সরে যায়। মুহূর্তেই কয়েক লক্ষ মানুষ ভেতরে ঢুকে পড়ে। স্বৈরাচারী হাসিনা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে সামরিক হেলিকপ্টারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আমরা ইতিহাস পড়ি কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিই না। ইতোপূর্বে যত গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তার প্রত্যেকটির সূচনালগ্নে মহান উদ্দেশ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং মানুষ তার সুফল ভোগ করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যে, গণআন্দোলনের বহু নেতাই পরবর্তীতে রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ তথা সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী হয়েছে। বীরত্বের দিনগুলো কাজে লাগিয়ে খ্যাতি ও অর্থ আর পদ-পদবি হাঁকিয়েছে। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের চেতনা নষ্ট রাজনীতির পরতে পরতে হারিয়ে গেছে। আজকে আবু সাঈদ, মুগ্ধ, রাফসানদের মতো হাজারও তরুণ-তরুণী তাজা রক্ত ঝরিয়ে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিপর্যয়ের কথা মনে রাখবে তো শপথবদ্ধ সাথী?

অনেক রক্তে কেনা আমাদের সোনার বাংলা। মুক্তিযুদ্ধের পরেও স্বাধীনতার স্বাদ পাবার আশায় বহুবার রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। পিচঢালা রাস্তায় আর রক্ত দেখতে চাই না। ইতোপূর্বে গণআন্দোলনের অনেক শহিদ পরিবার ও মুক্তিকামী মানুষদের নামে নানা গুজব ছড়িয়ে সুবিধা হাসিল করেছে পচনশীল রাজনৈতিক নেতারা। বিভিন্ন ট্যাগ লাগিয়ে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কে কী আমি জানি না।

আমি জানি, সবার রক্ত লাল আর মানুষ মরেছে। যদি গণতন্ত্র আর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না ঘটে, তবে আবার ভাবতে হবে-এত প্রাণ, এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের বিজয় রুগ্‌ণ রাজনৈতিক নেতৃত্বে স্বাধীনতার স্বাদ অধরাই থেকে গেছে? ভোটাধিকার, গণতন্ত্র মুক্তির জন্য রাজপথে জনসাধারণের মিছিল রক্ত আর শক্তির অপচয়? শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলো বন্ধুমহলে আড্ডায় শুধুই স্মৃতি হবে?

আমরা সবাই জানি, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। রাষ্ট্রের দুর্দিনে স্বার্থসন্ধানী লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রাজনৈতিক স্বার্থবাদীরা উপাসনালয়ে ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, অতি উৎসাহী হয়ে কিংবা প্রতিহিংসায় জনসাধারণের ওপর হামলা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদে ভাঙচুর চালায়। ছাত্রজনতা জাগ্রত থাকতে হবে। বিজয়ের পর লাল সবুজের পতাকা উড্ডয়ন যেন ম্লান না হয়ে যায়। আলোর মশাল পতাকার মতো উড্ডীন রাখতে হবে, যতদিন অন্ধকার দূরীভূত না হয়। আজকে ভঙ্গুর অর্থনীতি, রাজনৈতিক দুর্বস্থা, সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতা, কেরানি থেকে সচিব পর্যন্ত ঘুস-দুর্নীতির ছড়াছড়ি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থ পাচার, গুম-খুন, মাদক-চোরাচালান, জনপ্রশাসনের অ-জবাবদিহি ও অস্বচ্ছতা, মানবতা ভূলুণ্ঠিত, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা, শিক্ষা-শিল্প-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দলীয়করণসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে বদ্ধতা থেকে মুক্ত করার সাধনাই আমাদের সাধনা হোক। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, ‘যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ’।

প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

সংকট উত্তরণে

আলেমসমাজের ঐক্য এখন সময়ের দাবি

• *রাইহান উদ্দিন*

ষোলো কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। সর্বশেষ জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৯০% মানুষই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের ইতিহাসের সাথে স্বভাবিকভাবেই জড়িয়ে আছে মুসলমানদের অবদান। দেশের মানুষকে ইসলামের আলো দেখাতে সুদূর ইয়েমেন থেকে ছুটে আসা হজরত শাহ জালাল ইয়েমেনি রহিমাহুল্লাহ, শাহ পরান রহিমাহুল্লাহ ও শাহ মাখদুম রহিমাহুল্লাহর মতো বিখ্যাত ধর্ম প্রচারকদেরকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস কল্পনা করা যায় না। কারণ তাঁদের প্রচারকৃত ধর্মের অনুসারীই যে দেশের শতকরা ৯০% মানুষ।

ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বর্তমান বাংলাদেশে আসতে দেশের মানুষদের বারবার পড়তে হয়েছে নানান বাধার সম্মুখে। প্রতিবারই জাতিকে পথ দেখাতে মীর নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ, মাওলানা ভাসানীর মতো মুসলিম নেতাদের সামনের কাতারে দেখা মিলেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন সংবিধান কিংবা একাধিক নেতার নেতৃত্ব বাংলাদেশের মানুষকে কখনো শান্তির সমাজ কিংবা রাষ্ট্র উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা পারেনি মদিনার মতো কিংবা খোলাফায়ে রাশেদার যুগের সেই জিনা-ব্যাভিচার, সুদ-ঘুস, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত একটি স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিতে। বাংলার আলেমসমাজ প্রচেষ্টা চালান মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত সেই শান্তির সমাজ উপহার দিতে। এক্ষেত্রে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা শাহ আহমদ শফী, মাওলানা দেলোয়ার হোসাঈন সাঈদীসহ আরো অনেক উলামায়ে কেরামের অবদান অনস্বীকার্য। এদের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কেউ কেউ আবার জালিমে কারাগারে শাহাদাত বরণ করেছেন।

তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, সুদূর অতীতে বাংলাদেশে উলামায়ে কেরাম কিংবা ইসলামি দলগুলোর মধ্যে তেমন বড় কোনো ঐক্য লক্ষ করা যায়নি। কওমি-আলিয়া, সুন্নি-ওয়াহাবি, মাজহাবি-লা মাজহাবি দ্বন্দ্ব আমাদের

আলেমসমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে। যার ফলাফলস্বরূপ দেশের শতকরা ৯০% মুসলমান হওয়ার পর ও এদেশে আলেমসমাজ কিংবা দাড়ি-টুপিওয়ালা সৎলোকেরাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার। এদেশে প্রতিনিয়ত ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক, ব্লগাররা আল্লাহ-রাসুল, সাহাবায়ে কেরাম, আলেমসমাজ, দাড়ি-টুপি নিয়ে ব্যঙ্গ করে যাচ্ছে। এর প্রতিবাদ করাতে কী হয়েছে, তা ২০১৩ সালের ৫-ই মে শাপলা চত্বরে সবাই দেখেছে।

দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসানের পর চলমান সংকট নিরসন এবং ইসলামবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এখনই উপযুক্ত সময় আলেমসমাজের ঘুরে দাঁড়ানোর। প্রয়োজন দ্রুত আলেমসমাজের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে তোলার। কওমি-আলিয়া, মাজহাবি-লা মাজহাবির দ্বন্দ্ব ভুলে এখনই রুখে দাঁড়াতে হবে সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে।

সম্প্রতি আশা জাগানিয়া বিষয় হলো, কওমি ঘরানার আলেম-উলামাদের সাথে জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ-এর আমীরের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশ নেন জমিয়তের মাওলানা মুনির কাসেমি, হেফাজতের মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, আজহারুল ইসলাম ও ফখরুল ইসলাম প্রমুখ। খেলাফত মজলিসের আমির, নায়েবে আমির, মহাসচিব প্রমুখ। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আল্লামা খুরশিদ আলম কাসেমী, মুফতি শারাফাত হুসাইন, মাওলানা আবু সাঈদ নোমান। উলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সেক্রেটারি মুফতি রেজাউল করিম আবরার। এ ছাড়াও আলী হাসান উসামাসহ দেশের অনেক গণ্যমান্য আলিমেদ্বীন এ সভায় অংশ নেন। স্বৈরাচার পতনের পর আলেমসমাজে/ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এমন একটি সভা ঐক্য গঠনের ব্যাপারে আমাদের আশান্বিত করে। দ্রুতই তা আলেমসমাজ এবং ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য গঠনে রূপ নিক-এটাই প্রত্যাশা।

শিক্ষার্থী, আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাধীনতা চাই জীবনজুড়ে

মাও. তাসনীম হোসেন

‘স্বাধীনতা’ শব্দটি বলতে যতটা সহজ, কাজে কর্মে কিন্তু তার মর্মার্থ অনেক। পৃথিবীতে এমন কোনো জীব নেই যে স্বাধীনতা চায় না। সবাই স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। কথার স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, চলার স্বাধীনতা, কাজের স্বাধীনতা এবং জীবনের স্বাধীনতা নিয়েই আমরা জীবন পরিচালনা করতে চাই। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এমনই কষ্টকর যে, আমরা ভাবতেও চাই না। কিন্তু আমরা চাইলেও স্বাধীন হতে পারি না। কেন? ভেবে দেখেছি কি একবার? আসুন তাহলে সেটাই জেনে নেওয়া যাক।

ঐক্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। একতাবদ্ধ থাকার মধ্যেই স্বাধীনতা নিহিত। প্রবাদে আছে, ‘একতাই শক্তি’। পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে তার মূলে ছিল একতাবদ্ধ জীবনযাপন। আর যত ধ্বংস হয়েছে তার মূলেও ছিল বিভেদ আর দলচ্যুত হওয়া। মিলেমিশে এক হয়ে শৃঙ্খল জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” তিনি আরও বলেন, “তোমরা সেসব লোকের মতো হয়ো না, যাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।” (সুরা আল ইমরান, আয়াত: ১০৫)

যদি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চাই, তাহলে দ্বিতীয় করণীয় হলো যোগ্য নেতার আনুগত্য। একজন যোগ্য নেতাই পারে স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে। কারণ, সে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শত্রুর সামরিক এবং রাজনৈতিক আক্রোশ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। তাই যোগ্য নেতার বিকল্প নেই। একতাবদ্ধ থেকে নিজেদের লোভ-লালসা ত্যাগ করে সকলের সম্মতিতে যোগ্য লোককে নেতা নির্ধারণ করে জীবন পরিচালনা করলেই স্বাধীনতার ভারসাম্য রক্ষা হয়। যেমনটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজরত উম্মে হোসাইন রা. বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, ‘যদি তোমাদের ওপর কোনো নাক-কান কাটা গোলামকেও নেতা নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদের আল্লাহ তাআলার কিতাব বা হুকুম মোতাবেক চালায়, তোমরা তার

কথা শুনবে এবং মানবে।' (সহিহ মুসলিম : ৪৭৬২)

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, 'নেতার কথা শুনতে ও মানতে থাকো, যদিও তোমাদের ওপর এমন হাবশি গোলামকেই নেতা নিযুক্ত করা হোক না কেন, যার মাথা দেখতে কিশমিশের মতো (ছোট) হয়।' (সহিহ বুখারিঃ ৭১৪২) যোগ্য লোককে নেতা না বানালে, হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে দলের নেতা নিযুক্ত করল; কিন্তু দলে তার চেয়ে বেশি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্টকারী ব্যক্তি রয়েছে, সে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে খেয়ানত করল, রাসুল সা.-এর সঙ্গে খেয়ানত করল এবং ঈমানদারদের সঙ্গে খেয়ানত করল।' (মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৯২)

স্বাধীনতার স্বাদ তৃপ্তিভরে পেতে চাইলে আমাদের তৃতীয় করণীয় নৈতিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে রক্ষা করা। পরিবার থেকে রাষ্ট্রের সকল অংশে নৈতিক মানসিকতার লোক নিযুক্ত করা। নৈতিক শিক্ষা পারিবারিকভাবে লালনের পাশাপাশি বিদ্যাপীঠ থেকে রাষ্ট্রীয় সকল কাজে এর চর্চা অব্যাহত রাখার মাধ্যমেই সুন্দর মানসিকতায় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা পাবে। বিকৃত মানসিকতা নিকৃষ্ট নীতির লোকের মাধ্যমে গুম, খুন, লুণ্ঠন, রাহাজানি, অর্থ পাচার, অত্যাচার আর দুর্নীতি হয়ে থাকে। নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে যেমন এ সকল অন্যায় বেড়ে চলে, সাথে সাথে দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হতে থাকে। ভিনদেশের কাছে নিজের দেশকে বিক্রি করে দিতে এদের মন কখনো বাধা দেয় না। নৈতিক গুণাবলির মধ্যে রয়েছে বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, উন্নয়নের মানসিকতা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা (মুদগাহ) আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরাটি হলো কলব।' (সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ৫০)

স্বাধীনতা ধরে রাখার অন্যতম মাধ্যমগুলোর মধ্যে শিক্ষা একটি। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতির স্বাধীনতা তত উন্নত। শিক্ষিত সমাজে অন্ধকার কখনো ধেয়ে আসে না। শিক্ষিত সমাজ থেকে বুদ্ধিমান চৌকস রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, চিকিৎসক জন্ম নেয়। তারা দেশকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, মানুষের জীবন কীভাবে উন্নয়ন করা যায় বুঝতে পারবে। অশিক্ষিত জাতি মোটেও এর কিছু বুঝবে না। হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ বা অপরিহার্য।' (সুনানে ইবনে মাজাহ) আর এজন্যই বলা হয়, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। মানে একটি রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি। যে রাষ্ট্র আর্থিকভাবে সচল, সে দেশ সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করতে পারে। দেশের আর্থিক উন্নয়নে সকলকে একযোগে শ্রম দিয়ে যেতে হবে। ইসলামের পাঁচটি উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ'। সুদ-ঘুস মুক্ত অর্থনীতি দেশকে শান্তি এবং চিন্তামুক্ত রাখতে পারে। অর্থনীতি ভালো হলেই আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে দেশকে দাঁড় করানো যাবে।

স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম আরেকটি বিষয় হলো, বহির্বিশ্ব এবং শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষায় সামরিকভাবে শক্তিশালী থাকা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেওয়া হবে, আর তোমাদেরকে জুলুম করা হবে না।" (সুরা আনফাল, আয়াত : ৬০)

যে দেশে সামরিক শক্তি যত বেশি শক্তিশালী, সে দেশ তত উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। কেননা দেশের বিভিন্ন কাজে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে শত্রুর কালো থাবা থেকে নিজেদের রক্ষা করার এবং প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকবে। এজন্য সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং যুদ্ধের চৌকস শক্তির সংযোজনের বিকল্প কিছু নেই, যদি স্বাধীনতা ধরে রাখতে চাই।

আমরা স্বাধীন থাকতে চাই। স্বাধীন হয়ে বাঁচতে চাই। আর স্বাধীনতা রক্ষা আমাদেরই করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা আমরা ব্যতীত অন্য কেউ রক্ষা করবে না। প্রবাদে আছে, 'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন'। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে আমাদের নিজ ব্যক্তিসত্তা থেকে স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। তবেই আমাদের স্বাধীনতা বিরাজমান হবে এবং জীবনভর স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারব।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

প্রবন্ধ

স্বৈরাচারের পতনই ন্যায়নীতির জন্ম

মাহমুদ হাসান ফাহিম

পৃথিবীতে একের পর এক পরস্পর বিরোধী শক্তির শাসন চলে আসছে। রাতের পর দিন হয়, আঁধারের পর আসে আলো। অমাবস্যার ঘোর অমানিশার পরে পূর্ণিমা যথানিয়মেই আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেশ ও সরকারের ক্ষেত্রেও এ নীতির ব্যতিক্রম হয়নি। যখনই কোনো জালিম সরকারের পতন হয়েছে, এক ন্যায়পরায়ণ সরকার তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অত্যাচারের অবসান মানেই ইনসাফের আবির্ভাব। রাতের বিদায় মানেই দিনের উদয়। অত্যাচারী জাতির শক্তি যখন লোপ পায়, তখনই এক ন্যায়পরায়ণতার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফেরাউনের অত্যাচারমূলক শাসনের অবসান এক ন্যায়পরায়ণ সরকারের আবির্ভাবের পূর্বাভাস ছিল। তাই ফেরাউনের অনিবার্য ধ্বংসের সংবাদের সঙ্গে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার সুসংবাদও এসেছে পবিত্র কুরআনে। ফেরাউন কর্তৃক পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তার অধিবাসীদেরকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্তিকরণ ও তাদের এক শ্রেণিবিশেষকে অত্যন্ত দুর্বল করে রাখা ইত্যাদির ফলে কুরআনের ভাষায় সে পৃথিবীতে 'অনর্থ সৃষ্টিকারী' খেতাবে ভূষিত হয়েছে। আর যাদেরকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদের হতে এলো। সে দেশের ভূমি ও সম্পদের উত্তরাধিকারী তাদেরকেই বানানো হলো। (সুরা কসাস, আয়াত: ৪-৫) ফলে তারাই হলো বড় বড় তখত ও তাজের মালিক। তাদের রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত হলো। একসময় ফেরাউন ও হামানরা যেসব ব্যাপারে ঠকিয়ে তাদের দুর্বল করে রাখত, পরে সেসব অবস্থা তাদের ভাগ্যেই দেখা দিলো। এ ছিল ফেরাউনের রাজত্বে বিপ্লব সৃষ্টির কাহিনি। কিন্তু ভেবে দেখুন, এই ঘটনার নিমিত্তে কুরআন কী এক চিরন্তন খোদায়ি বিধানের সংবাদ বয়ে এনেছে। কুরআন বলছে, পৃথিবীটা যেন জাঁকজমক ও শক্তি প্রতিপত্তি দেখাবার কেন্দ্রস্থল এবং সেই সাথে দুর্বলদের নিধনের যজ্ঞশালা। শক্তিশালী জাতিগুলো দুর্বল জাতিগুলোকে দাস বানিয়ে রাখে, তাদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করে, তাদের বিভিন্ন দল ও শ্রেণিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। কারণ, তারা সংহত হয়ে গেলে আর দুর্বল থাকবে না। ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং জালিমের তখত

উল্টিয়ে ফেলবে। এ নজিরই প্রতিষ্ঠা করেছিল মিসরের বনি ইসরাইলগণ।

আবার এমনও হয়, যখন অত্যাচার ও অহংকার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন পৃথিবীটা শক্তিশালীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দুর্বলদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখন যে মাটিতে দুর্বলকে বলিদান করা হতো, সেখানে সবলদের নিধনযজ্ঞ গড়ে তোলা হয়। সেদিন ছোটকে বড় এবং বড়কে ছোট করে দেওয়া হয়। যারা দুর্বল, অসহায়, যারা শুধু কান্না, হাহাকার, মাতম তোলা ও গড়াগড়ি খাবার লোক, তখন তাদের ওপরেই আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। তখন শক্তিবানদের দুর্বল, সামর্থ্যবানদের অসহায়, আনন্দিতদের কান্নারত ও বিলাসীদের মাতমকারী এবং লুণ্ঠকদের লুণ্ঠিত সাজিয়ে গোটা পৃথিবীকে দেখানো হয়।

পবিত্র কুরআনে এ কথাই বলা হয়েছে, ‘বলুন, হে আল্লাহ, সার্বভৌম শক্তির মালিক; আপনি যাকে চান ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে চান ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে চান লাঞ্ছিত করেন। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (সুরা আল ইমরান, আয়াত: ২৬)

আল্লাহ কাউকে রাজত্ব দিয়ে সম্মানিত করেন। আবার কাউকে করেন পরীক্ষা। যারা ন্যায়-ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে এই ক্ষমতা তাদের জন্য সম্মানের। আর যারা ক্ষমতাকে নিজের অর্জন মনে করে ইচ্ছাধীন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, এই ইতিহাস তাদের জন্য মহাসত্যের পরম শিক্ষা।

এমনটা মনে করার সুযোগ নেই এই গদি আমার অধিকার। ফেরাউন ইতিহাস থেকে হারিয়ে যায়নি। কেয়ামত পর্যন্ত আগত শাসকদের জন্য জুলুমের ভয়াবহ পরিণতির কথা সে মনে করিয়ে দেয় এবং তার মতো না হওয়ার অনুরোধ জানায়। এটা এমনই এক মহাসত্য, যে সত্যের মৃত্যু নেই।

লেখক, আলেম ও মাদরাসা শিক্ষক

অভ্যুত্থানের সার্থকতা অর্জিত হোক

হুসাইন আহমদ

স্বাধীনতা মানে আকাশের বিশালতাসম মুক্তির পদচিহ্ন, অধিকারের স্বপ্ন ও জীবনের পরম চাওয়া পূরণ। আরেকভাবে স্বাধীনতা মানে মানুষের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের এক রূপকল্প। কেননা দুর্বল, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা যখন তাদের প্রাপ্য পাওনাটুকু বুঝে নিতে চায়, তখনই তাদের ভিতরে একধরনের স্বাধিকারবোধের সৃষ্টি হয়। এই স্বাধিকারবোধ ও অধিকারের চাওয়া থেকেই মূলত মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ হয়। অর্জিত হয়।

আর এই প্রতিটি স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসই থাকে সহস্র বছর ধরে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান। কেননা এই স্বাধীনতাগুলো মূলত আমাদের মধ্যে হঠাৎ করে উদয় হওয়া কোনো বিষয় নয়, বরং প্রতিটি স্বাধীনতা অর্জনেই রয়েছে ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস। শহিদদের ইতিহাস। শহিদ আবু সাঈদ ও মুগ্ধদের মতো বীরদের জীবন উৎসর্গের ইতিহাস। আর এই ইতিহাস অর্জনের জন্য সময়ের প্রতিটি কার্যকর মুহূর্তই যেন ধাপে ধাপে একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলে মুক্তিকামী মানুষের দুয়ারে। যেমন ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে সংগ্রাম শুরু করা বাঙালি জাতি পরবর্তী ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০'র নির্বাচন পেরিয়ে ১৮৭১'র মহান স্বাধীনতার পর ২০২৪'র অভ্যুত্থানের এই দ্বিতীয় স্বাধীনতার সূর্যটি ছিনিয়ে নেয় আমাদের ছাত্রজনতা বীরদর্পে। আর এগুলোর প্রতিটি ধাপে ধাপে আমাদের বাঙালি জাতি প্রমাণ করেছে যে, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতটা। স্বাধীনতার সুখ থেকে বঞ্চিত না হয়ে পরাধীনতার শিকল ভেঙে দেওয়া কতটা উত্তম।

তাই ২৪'র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজনের চাওয়া-পাওয়া। আর এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যতাই মানুষকে তাদের অধিকারের প্রশ্নে সজাগ করে তুলেছে,

গড়ে তুলেছে তুমুল আন্দোলন। ফলে ১৯৭১'র মতো ২০২৪ খৃষ্টাব্দেও অভ্যুত্থানের সময় সুযোগ এসেছে, স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যোদয় হয়েছে। বিজয়ের সময় এসেছে। বিজয় এসেছে। ২০২৪'র অভ্যুত্থান হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

হ্যাঁ, অভ্যুত্থান পরবর্তী আমাদের মনে রাখা উচিত যে, স্বাধীনতা মানে শুধু আঁকিবুকি করে একটি লাল বৃত্ত তৈরি করা নয় বরং 'সূর্যাকার' সেই বৃত্তটিকে মহাকাশে পৌঁছে দিয়ে পুরো জাতির জন্য প্রাপ্য আলোটুকু নিশ্চিত করার মধ্যেই স্বাধীনতার সাফল্য লুকায়িত। যে সূর্যের আলো সেদিন বীর বাঙালি তার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। সেই আলোর উজ্জ্বলতা আমরা কতটুকু বজায় রাখতে পেরেছিলাম? সেই বিস্তীর্ণ পথে কতটুকুই বা হাঁটতে পেরেছিলাম আমরা? এই কথাগুলো প্রশ্নবিদ্ধই ছিল। আমরা কি স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করছিলাম? আমরা কি স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছিলাম? আচ্ছা, যা হোক, এখন ২৪'র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা আরেকটি স্বাধীনতা লাভ করেছি।

এখন আমাদেরকে এই অভ্যুত্থান পরবর্তী স্বাধীনতা আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। আমাদেরই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে হবে। এসব নিয়ে আলোচনা সমালোচনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হই যে, ২৪'র অভ্যুত্থান ও স্বাধীনতার মতো বৃহৎ বিষয়টি সন্মুখে রেখে জাতি হিসাবে আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আরও সজাগ হতে হবে। আরও কিছু করতে হবে। মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা, দু'মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা কিংবা নিজের মতো পথ চলার যে স্বাধীনতা, এসব নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়েই সমাজ থেকে সকল অনিয়ম, অভিযোগ এবং অধিকারহীনতা থেকে মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব।

এজন্য শুধু জাতীয় সংগীতের সুরে পতাকাকে সুউচ্চে উঠানোই স্বাধীনতা হিসেবে ধরা যাবে না। বরং এই স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিতে পতাকার লাঠিকে ঐক্যবদ্ধ হাতের বাঁধনে রাখতে হবে। এই হাতকে শক্ত রাখতে, অর্জন করতে হবে বৈষম্যহীন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকারের স্বাধীনতা।

তবে স্বাধিকার থেকে অর্জিত এই ২৪'র অভ্যুত্থান বা স্বাধীনতাকে যদি মুক্তি দিতে না পারা যায়। তবে আমাদের স্বাধীনতার সার্থকতা অপূর্ণই রয়ে যাবে। অধরাই রয়ে যাবে।

তবে হ্যাঁ, আমরা বাঙালি আশাবাদী জাতি, আমাদের পথচলায় অবিচল, কর্মের মাধ্যমে উজ্জ্বল, সমাজের এই তরুণ প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অর্জিত ২০২৪'র অভ্যুত্থান বা এই দ্বিতীয় স্বাধীনতাকেও মহাকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রে পরিণত করতে পারবে ও বৈষম্যহীন, সুন্দর পৃথিবী নির্মাণে অনন্য উচ্চতায় এগিয়ে যাবে এই দেশকে একদিন, ইনশাআল্লাহ। সর্বোপরি, তরুণ প্রজন্মের ছাত্রজনতার এই স্বাধীনতার মানচিত্র যেন অক্ষুণ্ন থাকে ও অভ্যুত্থান বা স্বাধীনতার সার্থকতা যেন অর্জিত হয় এই তরুণ প্রজন্মের ছাত্রজনতার হাতেই। আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

মাদরাসা শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

স্বাধীনতার সূর্যোদয়

ইরফান বিন আহমদ

রাজ সকালে ঘুম থেকে ওঠামাত্রই মনটা বেশ ভারী হয়ে থাকত। দিনভর উৎকণ্ঠা আর বিষণ্নতায় ডুবে থাকতাম। শুধু একটাই ভাবনা- কেমন কাটছে আন্দোলনকারীদের রাতদিন, কেমন সময় পার করছে সন্তানহারা মায়েরা, বাবা হারা সন্তানেরা। এই একটি ভাবনা আমার দিন আমার রাত আমার অবসর এমনভাবে ভরিয়ে রেখেছিল যে, কীভাবে দিন আসে, কী করে রাত হয় কিছুই বুঝতে পারতাম না। আমার ভাবনার সবটুকু আয়তন এই চিন্তাটি দখল করে নিয়েছিল।

পুরো দেশ জুড়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে নেমেছিল দেশের ছাত্রসমাজ। কিন্তু স্বৈরশাসক নিজের একক ক্ষমতা প্রয়োগ করে জুলুমের কালো হাত প্রসারিত করে। আর তার সেই দীর্ঘদিনের কালো হাতকে ভেঙে দিতে একযোগে পথে নামে সর্বশ্রেণির আমজনতা। বিষয়টি সাধারণ আন্দলোন থেকে সরকার পতনের আন্দলনে রূপ নেয়। ফলে স্বৈরাচারের চেয়ারের তখন নড়বড়ে অবস্থা। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অপব্যবহার করে অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে হাজারো মানুষকে। দিনের পর দিন রক্তের হলিতে রক্তাক্ত হচ্ছিল বাংলার রাজপথ। রাষ্ট্র বিনির্মানের চেতনা আর সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বন্দুকের সামনে নিঃসংকোচে বুক পেতে দেয় অনেকে। হাসিমুখে বরণ করে নেয় শাহাদাতের অমিয় সুধা। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বন্দুকের বুলেটও একটা সময় ফুরিয়ে আসে। আর মাজলুমদের আর্তনাদ কখনো বৃথা যায় না। এভাবে পুরো ৩৬ দিন টানা আন্দোলন, ত্যাগ ও কুরবানির পর আসে বিজয়বার্তা।

৫ই আগস্ট। বাঙলার ইতিহাসে রচিত হয় এক নব-উপাখ্যান। চারিদিকে বিজয়ের উল্লাস। একদম ছোট শিশু থেকে নিয়ে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া বৃদ্ধের চেহারায়ও ফুটে ওঠে হাসির ঝিলিক। জুলুমের জাঁতাকলে পিষ্ট জাতি আবারও ফিরে পায় জীবনের স্বাদ। কারণ, আজ বাংলাদেশ পুনরায় স্বাধীন হয়েছে। ক্ষমতার বড়াই করা জালেমরা সব দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। পাল্টে গেছে বাঙলার চিত্র। বিজয়ের নির্মল সমীরণে প্রাণবন্ত হয়েছে দেহমন। ফলে ব্যথাতুর হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠেছে। পূর্ব দিগন্তে প্রকাশিত হয়েছে ‘স্বাধীনতার সূর্যোদয়’।

শিক্ষার্থী, জামিয়া আশরাফিয়া মহিউদ্দিননগর, শহিদবাড়িয়া।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ২.০

ওমর ইবনে আখতার

৩৫শে জুলাই। ৪ঠা আগস্ট। সেদিন আমাদের অবস্থান ছিল মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ। প্রথমে ৪০ ফিটে দুপুর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান শেষে আমরা জোহর নামাজের পর খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাই আল্লাহ করিম মসজিদের দিকে। গন্তব্য শাহবাগ মোড়। ফ্যাসিবাদের কবর রচনার বধ্যভূমি। পথিমধ্যেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ছাত্রলীগ যৌথবাহিনী। তারা যেন কোনো বিশাল শক্তিধর সুসংহত সৈন্যদলের সাথে লড়াইয়ে এসেছে। শুরু থেকেই আমাদের অবস্থান ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সংঘর্ষ বিমুখ।

সেনাবাহিনী তুলনামূলক ছাত্রদের প্রতি সহনশীল থাকলেও মারমুখী অবস্থানে ছিল পুলিশ ও স্বৈরাচার হাসিনার সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ।

যেহেতু আমরা সংঘাত চাচ্ছিলাম না, তাই বারবার সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের কাছে অনুরোধ করি, আমাদেরকে যেন শাহবাগ অভিমুখে অগ্রসর হতে দেয় এবং কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা না হয়। আমাদের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ। লক্ষ্য অভীষ্ট। গন্তব্য ফ্যাসিবাদের কবর রচনা। এসময় দায়িত্বরত পুলিশ-অফিসাররা ছাত্র সমন্বয়কদের আশ্বস্ত করে, তারা বিকেল চারটা নাগাদ আমাদের পথ ছেড়ে দেবে এবং রাস্তা থেকে হটিয়ে দেবে সরকারি সন্ত্রাসীদেরকে। কিন্তু পুলিশ আমাদের ধোঁকা দেয়। আশ্রয় নেয় বিশ্বাসঘাতকতার। মানবতা ভুলে নিজেদেরকে ঢেকে নেয় পশুত্বের আবরণে। তারা একদিকে আমাদেরকে বলে শান্ত থাকতে আর অপরদিকে হামলার জন্য জড়ো করতে থাকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকে।

ঘড়ির কাঁটায় ঠিক চারটা বাজে। ছাত্রজনতার নিরবচ্ছিন্ন স্লোগান চলমান। যেন ক্লান্তি নেই কোনো কণ্ঠে। প্রতিটা কণ্ঠ শয়তানের উপর করে চলেছে অবিরাম বজ্রাঘাত। এটা সহ্য হলো না জালিম ফ্যাসিস্টের। আকস্মিক আমাদের উপর একযোগে হামলে পড়ে পুলিশ ও সন্ত্রাসীলীগের সম্মিলিত বাহিনী।

মুহূর্তেই সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারগ্যাস ও ছররাগুলির বর্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়

নিরীহ ছাত্রজনতা। প্রলয়ঙ্করী সাউন্ড গ্রেনেড ও প্রাণঘাতি রাইফেলের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে আকাশ-বাতাস। যেন দখলদার ইজরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলার শিকার ফিলিস্তিনে আছি। বিকালের আকাশেই নেমে আসে অমাবস্যার অন্ধকার। দিগ্বিদিক ছুটতে থাকি আমরা। কত ভূপাতিত দেহের উপর দিয়ে প্রাণ রক্ষায় ছুটে এসেছি সেদিন আজ আর মনে নেই। দুই ঝাঁক ছররাগুলির বর্ষণ স্বীয় পিঠে এখনও যেন সুস্পষ্ট অনুভূত। রক্তে রঞ্জিত জামা আর তাজা বুলেটের আঘাত কি দমাতে পেরেছিল মুক্তিপাগল সাধারণ ছাত্রজনতাকে? না। বরং তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। প্রাণঘাতী বুলেটের মোকাবেলা করেছে ইটের টুকরা নিয়ে। এগিয়ে গিয়েছে বীরদর্পে। এরা যেন শাহাদাতের নেশায় উন্মুক্ত উন্মাদ। এদের জীবন নিয়ে নেই কোনো ভাবনা। এরা চায় শুধু ইনকিলাব, মুক্তি, স্বাধীনতা।

একদিকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সাঁজোয়া যানে সজ্জিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীবাহিনী, অপরদিকে অস্ত্রশস্ত্রহীন একঝাঁক তরুণ ছাত্রজনতা। ঘণ্টাখানেক চলতে থাকে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া। একপর্যায়ে ফুরিয়ে আসে পুলিশ বাহিনীর গোলাবারুদ। আমাদের দুর্বল ক্ষীণচোখে হাতছানি দিয়ে যায় বিজয়ের আলেয়া। নির্বিক তরুণতুর্কী নয় বরং বাংলার তরুণ দামালেরা এগিয়ে যেতে থাকে সম্মুখপাণে। দুর্বার, দুরন্ত, যেন প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণি। কী তাদের গতি! কী তাদের মুভমেন্ট!

কিন্তু না, পারল না বেশি দূর অগ্রসর হতে। সেই মুহূর্তে পরাজিত পুলিশ সামনে বাড়িয়ে দেয় স্বৈরাচার, গণহত্যার নায়ক, জালিম ফ্যাসিস্ট হাসিনার সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগকে। এই দয়ামায়া আর মানবতাহীন, হিংস্র হায়ানার দল কোনোকিছু না ভেবেই শুরু করে গণহত্যা। একে একে আমার চোখের সামনে ঝড়ে পড়ে একঝাঁক তরুণের নিষ্পাপ প্রাণ। এমনকি এই নির্মমতা থেকে রেহাই পায়নি আট বছর বয়সী শিশুও।

সেদিন শহিদদের পবিত্র রক্তে ধুয়ে গিয়েছিল এই পরিচিত নগরির রোডঘাট। মোহাম্মাদপুরের মসজিদগুলো সেদিন বঞ্চিত হয়েছিল জামাত থেকে। রক্তের যে নজরানা তা-ই যেন আদায় করেছে এই নগরি ও এর প্রতিটি ইমারত-ইবাদতগাহ। ফ্যাসিস্ট বিরোধী ছাত্রজনতা সেদিন আবারও রক্তের আলপনায় মোহাম্মদপুরের নাম লেখিয়েছিল ইতিহাসের নতুন পাতায়। যে নাম যুগযুগ ধরে রয়ে যাবে চির

অম্লান। সাথে একদল মুক্তিকামী শহিদ শার্দূলের নামও।
আজ আর ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচার, রক্তখেকো এই জমিনে নেই। মুক্তিকামী জনতার রক্তে ধুয়েমুছে গেছে তাদের চিহ্নটুকুও। ডাইনির কালো হাত হয়ে গেছে টুকরো টুকরো। উল্টে গেছে তার দম্ভের সেই মসনদ। কিন্তু সেদিনের ভয়াল ও বিভৎস স্মৃতি আজও রয়ে গেছে আমার হৃদয় তটে। এখনো তন্দ্রাঘোরে আঁতকে উঠি সন্তানহারা সেই মায়েদের আর্তচিৎকারে। কেঁপে উঠি আট বছরের শিশুর দ্বিখণ্ডিত মাথা...। আমাকে তাড়া করে বেড়ায় বিচ্ছিন্ন মাথার সেই ছেলেটি।

পূর্ব জাজিরা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

ক্ষুধায় যে ছটফট করে তাকে জিজ্ঞাসা করো একটুকরো রুটির মূল্য! পিপাসায় প্রাণ যার ওষ্ঠাগত তাকে জিজ্ঞাসা করো এককাতরা পানির মূল্য।

স্মৃতিতে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান

উবাইদুল্লাহ তারানগরী

২রা আগস্ট শুক্রবার। জুমার বয়ানে আলোচনা করি-যুগে যুগে জালেমের পরিণতি। অনেকের ভালো লাগেনি। না লাগাটাই স্বাভাবিক। এদিকে গণহত্যা তো চলছেই। মনও ছটফট করছে বিজয়ের খবরে শান্ত হতে। কিন্তু স্বৈরাচার সরকারের স্বৈরাচারী বাহিনীর গুলিতে শহিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তর যে আর সইছে না। পড়ে আছি এখানে মন তো আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। ৩রা আগস্ট শনিবারও অনেকে নিহত হন। তাই পোস্ট করি 'আবারো গুলি! হে আল্লাহ! জালিমের পতন ত্বরান্বিত করো'। এই পোস্টও কীভাবে যেন মসজিদ কমিটির নজরে পড়ে। ফলে দোকানে দোকানে আমার সমালোচনা হতে থাকে।

একপর্যায়ে ফোনে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। হায় পরাধীন দেশ! এতটুকুও স্বাধীনতা নেই! দোয়া অব্যাহত রাখছি। আল্লাহ যেন বিজয়ী করেন আন্দোলনকারীদের। কারণ ছাত্ররা যদি হেরে যায়, হেরে যাবে বাংলাদেশ। রবিবারেও এক দফা দাবিতে ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনের ডাক ছিল। দিন যত যাচ্ছে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর ও গতিময় হচ্ছে। সব শ্রেণিপেশার মানুষ যোগ দিচ্ছে। হেফাজত, চরমোনাইসহ ইসলামি সব দলগুলোও সংহতি জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আজও প্রায় ১০৩ জনের মত শাহাদাত বরণ করেছে। পুলিশ তো মরিয়া হাজার লাশ ফেলেও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে চায়। স্বৈরাচার টিকে যাওয়া মানেই যেন তাদের চাকরি টেকার নিশ্চয়তা। এদিকে সেনাবাহিনীর একাংশকে ছাত্রদের সহযোগিতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে দেখা গিয়েছে। তাই অনেকে আশাবাদীও হয়ে উঠেছেন। আগামীকালের 'মার্চ টু ঢাকা'তে সেনাবাহিনীর নিরবতা পেলেও অনেক বড় সহযোগিতা হবে এবং ছাত্রসমাজের বিজয় নিশ্চিতের পথে, ইনশাআল্লাহ।

আজ ৫ই আগস্ট, সোমবার। 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ৬ই আগস্ট মঙ্গলবারের কর্মসূচি আগানো হয়েছে উত্তেজিত ও ফুঁসে ওঠা

আন্দোলনরত জনতার দাবিতেই। কারণ গণহত্যার সারি বেড়েই চলছে। গতকালও প্রায় শতাধিক ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়েছে। মোট সংখ্যা সহস্রাধিক হবে। এযে আর সইছে না।

মৃত্যুর মিছিল আর দীর্ঘ হতে চায় না। বিক্ষুব্ধ জনতা চায় স্বৈরাচারের নির্মূল ও পতন। তাই আজ জড়ো হবে শাহবাগ, অতঃপর বঙ্গভবন ঘেরাও হবে। তারুণ্যের এই আন্দোলন-স্পিরিট নিশ্চিত বিজয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এদিকে গতকাল সন্ধ্যা থেকেই স্বৈরাচারী সরকার কারফিউ জারি করেছে সারা দেশে। ছাত্র সমন্বয়কগণও সঙ্গে সঙ্গে সেই কারফিউ প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেন। দুই দিন ধরে নেটও পুনরায় বন্ধ করে দেয় স্বৈরাচার। কোনো খবরও পাওয়া যাচ্ছিল না। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সময় যাপন করছিলাম। চরম বৈরী হাওয়ায় থাকার কারণে নামাজ তিলাওয়াত করে আন্দোলনকারীদের জন্য দোয়া করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না আমার। ফোন করে জানতে পারলাম সারা দেশ থেকে পঙ্গপালের মতো মানুষ ছুটে আসছে ঢাকায়।

জোহরের নামাজ পড়াতে মসজিদে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম একজনকে-কী খবর ভাই? বললেন, টিভিতে খবর দেখলাম, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছাত্ররা বসে আছে সেনাবাহিনী দেখে পিছু হটে, চলে গেলেই আবার আসে। ভাবখানা এমন যে কারফিউ কয়দিন রাখবে রাখ দেখি, আমরাও আছি। বিজয় না নিয়ে ঘরে ফিরব না।

–বিজয়ের মহা সুসংবাদ

বাদ জোহর খাওয়াদাওয়া শেষে শুয়ে আছি। নেট না থাকায় মোবাইলে ব্যর্থ স্ক্রল করছি। একসময় আধো ঘুমের মধ্যে চলে যাই। ততক্ষণে রাজপথে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী-জনতার বিপ্লব ঘটে গেছে। বিজয়োল্লাসে মেতে উঠেছে পুরো দেশ। সেনাবাহিনী লাখো লাখো মিছিলকারীদের সুযোগ করে দেয়। ফলে বিদ্যুৎ গতিতে তীব্র জনস্রোত বঙ্গভবনে চলে যায়। শ্রীলঙ্কার স্টাইলে শুরু হয় আন্দোলনকারীদের তাণ্ডব উল্লাস প্রতিক্রিয়া। নানা ছলচাতুরী ও আরও খুনের কুটকৌশল কোনো কিছুই কাজে আসে নাই। ফলে হেলিকপ্টারে করে লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মীদের বিপদে ফেলে শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা পালিয়ে যায় পাশের রাষ্ট্র ভারতে। এই সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লে বিজয় মিছিলে মুখরিত হয়ে যায় পুরো দেশ।

মুহুর্মুহু আনন্দ স্লোগান 'পালাইছেরে পালাইছে, শেখ হাসিনা পালাইছে' এতকিছু হয়ে গেল ও যাচ্ছে, আমি

কিছুই জানি না। হঠাৎ শুনি প্রতিবেশী হেলাল ভাইয়ের ব্যতিক্রমী ডাক। দ্রুত বের হতেই উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বলে, গুড নিউজ হুজুর! শেখ হাসিনা দেশ ছাইড়া পালাইছে। আমিও তো খুশিতে আত্মহারা। মনির ভাইয়ের দোকানের পাশ থেকেও আসছে সমস্বরে আওয়াজ। ফোন খুলতেই দেখি উত্তাল ঢাকায় রবরব সাজ। বিজয়ের আনন্দে একাকার। এযেন মহা ঈদের আনন্দ। বাঁধ ভাঙা জোয়ার। কেউ লিখছে, আলহামদুলিল্লাহ বিজয়। কেউ ঈদ মোবারক। কেউ স্বৈরাচার মুক্ত হলো দেশ। নানা অভিব্যক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করছে। আমিও লিখলাম, 'আলহামদুলিল্লাহ বিজয় বিজয় বিজয়'। সঙ্গে সঙ্গে ফোন দিলাম বারিধারার শিক্ষক গোলাম রাজ্জাক কাসেমী ভাইয়ের কাছে। তিনিও বললেন হাঁ, শেখ হাসিনা পালাইছে। আমরা লাখো জনতা বঙ্গভবনের দিকে যাচ্ছি।

পরে দেখি মোবাইলে বঙ্গভবন ও সংসদ ভবনের অবস্থা এককথায় ইতিহাস। ছাদে উঠে, গাছে চড়ে, হাউজে গোসল করে, মাছ ধরে, মুরগি ধরে, হাঁস ধরে, বেগুন তুলে, ফ্যান খুলে, সোফা মাথায় নিয়ে, চেয়ারে বসে, খাটে শুয়ে, ফ্রিজ খুলে নিয়ে আনন্দ করেছে। এককথায় রান্না করা খাবার খাওয়াসহ অঢেল সম্পত্তি থেকে যে যা পেয়েছে, তা-ই গনিমতের মালের মতো ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। পরে অবশ্য কেউ কেউ সামান্য ফেরত দিয়েছে। সংসদেও চলেছে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড।

পরক্ষণেই একের পর এক ফোন আসতে শুরু করে। বিজয়ের সুসংবাদ জানাতে।

–বিজয় মিছিলে যোগদান

ততক্ষণে সাড়ে তিনটা বাজে। প্রিয় মুসল্লি জুন্নুন ভাইয়ের ফোন। প্রথমে ঈদ মোবারক ও বিজয়ের শুভেচ্ছা জানানোর পর আবার ফোন দিয়ে বলল, হুজুর চলেন মিছিলে যাবো। জয়দেবপুর যাবো। আমিও বের হলাম মনে মনে বললাম, দেশের প্রায় সব উলামা কেরাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, ঢাকাওয়ালারা আজও মাঠে আছে তাই অন্তত সংহতি ও সাদৃশ্য অবলম্বন করি বিজয় মিছিলে শরিক হয়ে। রিকশা থেকেই স্লোগান শুরু করি; 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার; পালাইছেরে পালাইছে, শেখ হাসিনা পালাইছে; হৈ হৈ রৈ রৈ, কাউয়া কাদের গেলি কই; ছাত্রলীগ গেলি কই।''

মুক্তমঞ্চে গিয়ে দেখি হাজার হাজার জনতার উল্লাস মিছিল, স্লোগান, বক্তব্য, মূর্তি ভাঙচুর, লীগীয় পোস্টার উচ্ছেদ ও আগুন দেওয়া। মুক্তি পায়নি পুলিশবক্সও। তবে হিন্দুদের মূর্তি ও মন্দিরে কেউ কোনো আঘাত করেনি।

স্লোগান দিতে দিতে গলা ভেঙে যায়। আসর পর্যন্ত মিছিল স্লোগানে মুখর থেকে জয়দেবপুর কেন্দ্রীয় বড় মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করি। অতপর আবার শুরু স্লোগান-মিছিল। সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল মুক্তমঞ্চের পশ্চিম পাশের মূর্তিগুলো ভাঙতে ও স্লোগান দিয়ে আগুন জ্বালাতে। তিন সড়ক, রাজবাড়ী মাঠ, এখানে মুক্তমঞ্চসহ, সারা দেশেই মূর্তি ভাঙার প্রতিযোগিতা ও উল্লাস হয়েছে। উলামায়ে কেরাম বলেছিলেন মূর্তি ও ভাস্কর্য বানিয়ে মৃতদের দুনিয়া আখেরাতে লাঞ্ছিত না করতে। তখন ভালো লাগেনি এখন বোঝো।

আল্লাহর মাইর দুনিয়ার বাইর। আসরের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে একের পর এক মিছিল আসতে থাকে। জমিয়তের মাওলানা নাসির উদ্দিন ভাইয়েরও তৎপরতা দেখলাম। ক্যামেরা ও মোবাইলের সামনে আমিও বক্তব্য দিয়ে মিছিল নিয়ে রাজবাড়ী মাঠে যাই। জুন্নুন ভাইয়ের লাফানো ও আবেগ ছিল অসাধারণ! আমরা স্লোগান দিই; ‘এই বিজয় কাদের? ইসলামের ইসলামের।

এই বিজয় কাদের? ছাত্রদের ছাত্রদের।
এই বিজয় কাদের? জনতার জনতার।
ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই।’

রাজবাড়ী মাঠেও জ্বালাময়ী বক্তব্য দিই মিছিল নিয়ে আসা বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের সামনে রেখে। দেখলাম মাঠের পিছনেও মূর্তিগুলোতে আগুন জ্বলছে। মাঠভর্তি মানুষ খোলা আকাশে স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে বিজয় উদযাপন করছে। আকাশেও দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে পাখি বিজয়ের আনন্দে। একজনকে দেখলাম বলছে, বাপ গেছে যেই মাসে, মেয়েও গেছে সেই মাসে। মাঠ থেকে বের হয়ে দেখি রাস্তায় লেখা হচ্ছে ‘৩৬শে জুলাই ২০২৪ মহান বিজয় দিবস’।

–মূর্তির হবে ক্ষয়, আল্লাহু আকবারের হবে জয়

জুন্নুন ভাই বলল, হুজুর, ভাঙা মূর্তির ওই উঁচু চূড়ায় ‘আল্লাহু আকবার’ লিখে দিতে চাই। সুন্দর আইডিয়া তো! কাগজ খুঁজেন। কোথাও কাগজ পাওয়া যাচ্ছিল না। রাজবাড়ী মাঠের পাশে এক ফুলের দোকানে সাদা গোল বড় ফোম পেলাম। দোকানদার বলল, তিনশো টাকা লাগবে। জুন্নুন ভাই বলল, আরে তিনশো আর এক হাজার আছে? যা লাগবে তাই দেওয়া হবে। ফোম নিলাম। জুন্নুন ভাই মাদরাসায় কাফিয়া পর্যন্ত পড়ে ছিলেন। তখন থেকেই আর্ট জানতেন। তাই এখন কাজে লাগালেন। ইতোমধ্যেই দোকানে নানা মানুষের সুখ ভাগাভাগির আলোচনা চলতে লাগল।

এযেন দীর্ঘ ১৭ বছরের চাপা কষ্টের বাঁধনখোলা নিঃশ্বাস ফেলা। রাস্তা দিয়ে মিছিল তো আসছে যাচ্ছেই। হঠাৎ দেখি বিজয়ের মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে, আমরাও খেলাম। পেন্সিল দিয়ে লিখে ছুরি দিয়ে কেটে একপর্যায়ে লেখা শেষ হলো। মূর্তির স্থলে এটি টাঙানো হবে জেনে দোকানদার আর টাকা নিতে চাইল না। পরে জোর করে একশ টাকা দিই। রাজবাড়ী মাঠ থেকে আবার মিছিল করতে করতে জয়দেবপুর সেই মুক্তমঞ্চে আসি। স্লোগান তুলি, 'ভাস্কর্য্যের হবে ক্ষয়, আল্লাহু আকবারের হবে জয়; মূর্তির হবে ক্ষয়, আল্লাহু আকবারের হবে জয়।'

আমরা কয়েকজন মিছিল করে যাচ্ছিলাম, পথে পথে সমর্থন জানাচ্ছিল জনতা। এবং লাঠির মাথায় বাঁধা 'আল্লাহু আকবার' সম্বলিত প্ল্যাকার্ডের ছবি তুলছিল। জুন্নুন ভাইয়ের ভাতিজাও মাঝেমধ্যে ছবি তোলে। কাছে আসতেই দেখি আমাদের মাদরাসা জামিয়া ইবনে আব্বাস (রা.) সামান্তপুর-এর ছাত্ররা। তারাও যোগ হলো। সদ্য ভাঙা মূর্তির স্থলে এসে অনেক মানুষের সামনে জ্বালাময়ী এক ভাষণ দিলাম। এবং সর্ব উচ্চ চূড়ায় আরবিতে লেখা 'আল্লাহু আকবার' বেঁধে দিলাম। সমস্বরে চার পাঁচজন আজান দিলাম। মৃদু আওয়াজে বললাম, আল্লাহ, তোমার নাম বুলন্দ করলাম, এই উসিলায় মাফ করে দাও এবং এদেশে খেলাফত কায়েম করে দাও।' ইতোমধ্যেই কয়েকজন ছবি তুলে পোস্ট করে দিলো। লম্বা স্মৃতি এযে শেষ হওয়ার নয়। তবু ভাষণের কয়েকটি কথা উল্লেখ করে শেষ করে দিই। 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজিম, ওয়া জাআল হাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।' সংগ্রামী ছাত্র জনতা, বাংলাদেশ আজ ৩৬শে জুলাই ৫ই আগস্ট সোমবার ২০২৪শে দ্বিতীয়বার খুনি স্বৈরাচার শেখ হাসিনা থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিজয় লাভ করেছে।

এই বিজয় ছাত্রদের, এই বিজয় সবার। এই বিজয় জনতার। বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা নিরীহ ছাত্রজনতার রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। দেশের রাজপথ তাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। এই স্বাধীন বাংলাদেশে তিনটি গণহত্যার বিচার হতেই হবে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার, ৫ই মে ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গণহত্যার বিচার, সর্বশেষ জুলাই-আগস্ট ২০২৪শে গণহত্যার বিচার হতেই হবে। শেখ হাসিনাকে হুকুমের আসামি করে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতেই হবে। ঠিক ঠিক স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে পুরো অঙ্গন। পরিশেষে সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মাগরিবও বড় মসজিদে পড়ি। এবং ভাঙা গলায় এসে ইশার নামাজের ইমামতি করি নিজ মসজিদে। মুসল্লিরা ততক্ষণে যা বোঝার বুঝে গিয়েছে।

সালাম ফিরিয়েই দেখি পরাধীন দেশ

পরের শুক্রবার ৯ই আগস্ট। জুমার বয়ানে মন খুলে কথা বলি। ১৩ বছরে যা বলতে পারিনি। বিষয় ছিল 'অহংকার পতনের মূল'। বাদ পড়েনি পিলখানা হত্যাকাণ্ডসহ সকল গণহত্যা ও আয়নাঘরও। তবে সবকিছু কোরআন ও হাদিসের আলোকেই বলি। মোনাজাত পরবর্তী চার রাকাত সুন্নত শেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি আলহামদুলিল্লাহ যাক, মন খুলে বয়ান করতে পারলাম। তাই আরো দুই রাকাত সালাতুশ শুকর পড়ি। কিন্তু সালাম ফিরিয়েই দেখি কমিটির সদস্যবৃন্দ বসা। সতর্ক করতে যা বলার বলল। (অবশ্য আগের মতো উগ্র আচরণ করেনি) মনে মনে বলি, আসলে দেশ এখনো স্বাধীন হয়নি। স্তরে স্তরে বৈষম্য ও প্রতিবিপ্লবের শঙ্কা নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ জাতি পাবে না। তাই সবাইকে সদা ঐক্যবদ্ধ সতর্ক থাকতে হবে। স্বৈরাচার ও বৈষম্য মোকাবেলায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সফল হোক।

মুফতি ও মুহাদ্দিস: জামিয়া ইবনে আব্বাস (রা.) সামান্তপুর, জয়দেবপুর গাজীপুর সিটি।

পানি লাগবে, পানি?

হাফিজ বিন ইসমাইল

অত্যন্ত সাধাসিধে দুটি বাক্য; মাত্র চারটি শব্দ। জানিনা সাহিত্যমানে কদটুকু উত্তীর্ণ, কিন্তু প্রশ্নবোধক এই বাক্য দুটি আজ স্বাধীন বাংলার প্রতিটি মুখের সর্বাধিক আলোচিত বাক্য। চয়নকারী মানুষটি ধরার বুকে আজ আর নেই। কিন্তু তার অমূল্য এই বাক্যদুটি বাংলার প্রতিটি হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে গেঁথে আছে। পানি লাগবে? পানি! বাক্য দুটি একটি শক্তির নাম। নাম একটি চেতনার। প্রলয় সৃষ্টিকারী এক আবহের নাম। যুগান্তকারী এক ইতিহাসের নাম। যার উচ্চতা আকাশসম। মুগ্ধ; একটি বিপ্লবের নাম। নাম একটি গণজাগরণের। দৃঢ় প্রত্যয়ী অসীম মনোবলের অধিকারী এক ব্যক্তিত্বের নাম।

নিঃস্বার্থ এক দেশপ্রেমিকের নাম। প্রিয় শহিদ মুগ্ধ, তুমি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু রেখে গেছ দেশপ্রেমের এক বিরল দৃষ্টান্ত। দেশের তরে জীবন বিলিয়ে প্রমাণ দিয়েছ দেশপ্রেমের। শিখিয়ে গিয়েছ মানুষের জন্য মানুষ। ইতিহাসের পাতায় পাতায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে এই নাম। পানি লাগবে? পানি! যখনই বাক্য দুটি কানে আসে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই নববি যুগের দৃশ্য; যুদ্ধের ময়দান। ময়দানের এক কোণে মুমূর্ষাবস্থায় পড়ে আছেন কয়েকজন সাহাবি।

প্রচণ্ড পিপাসায় একজনের মুখ থেকে ভেসে এলো-পানি! একজন দৌড়ে এলেন মানবতার ফেরিওয়ালা হয়ে পানি পান করাতে। পান করাতে যাবেন ঠিক এসময় পাশ থেকে আওয়াজ-পানি! তিনি আর পানি পান করলেন না। বললেন, আগে আমার ভাইকে পান করাও। ছুটে গেলেন তিনি তার কাছে। পাশ থেকে আরেকজন-পানি! দ্বিতীয়জনও বলে উঠলেন আগে আমার ভাইকে পান করাও। তিনি দৌড়ে গেলেন তৃতীয়জনের কাছে। গিয়ে দেখেন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ফিরে আসলেন প্রথমজনের কাছে। এসে দেখেন তিনিও আর নেই। এভাবে দ্বিতীয়জন, তিনিও ছেড়ে গেছেন এই অস্থায়ী ধরা। এভাবেই তারা রেখে গেছেন এক আদর্শ। জনহিতের এক

উত্তম দৃষ্টান্ত। গড়ে গেছেন এক স্বর্ণখচিত ইতিহাস। হয়ে আছেন চির ভাস্বর। প্রিয় শহিদ মুগ্ধ, তুমি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু গড়ে গেছ এক ইতিহাস। রেখে গেছ বাংলার প্রতিটি সন্তানের জন্য এক উত্তম আদর্শ। হয়ে আছ অবিস্মরণীয়। পরওয়ারদিগারের কাছে দিল থেকে কামনা করি, কাল হাশরে লাভ কর রাসুলের শাফায়াত, পান কর রাসুলের হাতে হাউজে কাউসারের অমৃত সুধা। শহিদি মর্যাদা লাভ করে বাস কর চির সুখের জান্নাতে।

শিক্ষার্থী, দারুল উলুম নিযামিয়া মোমেনশাহী

‘আজকের তরুণ, সেই তো আগামী জীবনে জীবনের কর্ণধার! আজকের তরুণকে পথের আলো দেখাও, আগামী দিনে জাতি আলোর পথ পেয়ে যাবে’।

স্বৈরশাসকের পতন

আমির হামজা বিন সাত্তার

দীর্ঘ ষোলো বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট দল। দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, লুটপাট, মানুষ হত্যা, অন্যায়ভাবে মানুষকে কারাবন্দী করা, ভিন্ন দেশের চাহিদা মিটাতে নিজ দেশের জনগনের উপর জুলুম-অত্যাচার করা, তাদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা ও তাদেরকে স্বাধীনতা নামক পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ করে রাখাসহ, নানান অপকর্মে পুরো দেশটায় কেমন অরাজকতা আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলছে।
যখন কাউকে তাদের দলের ও মতের বিরুদ্ধাচারণ করতে দেখছে বা শুনছে, সাথে সাথে তাকে জেল-হাজতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কাউকে আবার সরাসরি হত্যা করে ফেলছে। শুধু সত্য কথা বলার অপরাধে কতশত আলেমকে কারাগারে পাঠিয়ে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করেছে। এসব অপকর্মকে তারা তাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত করেছে। বিন্দুমাত্র আফসোস আর লজ্জাবোধও করছে না এরা।

দেশের এমন নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটি মানুষ সদা-সর্বদা এ জালিম স্বৈরাচার থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছে। তাদের জুলুমের বিরুদ্ধে কলম ধরায় কত হুমকি-ধমকির শিকার হতে হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। তাদের জুলুমের মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এরা মানুষকে মানুষ মনে করতো না। যখন যাকে যেভাবে ইচ্ছা গুম করে রাখছে, কাউকে আবার হত্যা করে ফেলছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

"তুমি কিছুতেই আল্লাহকে জালিমরা যা কিছু করে তা থেকে বেখবর মনে করো না। তিনি তো তাদের সেদিনের জন্য ঢিল দিচ্ছেন, যেদিন চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।" (সুরা ইব্রাহীম: ৪২)

জালিমদের আল্লাহ পরাজিত করবেনই। অবশ্যই তাদেরকে পরাভূত করবেন। যেমনিভাবে

পূর্বেকার যামানার জালিম ফেরাউন, নমরুদদের পরাজিত করেছিলেন।

অতঃপর শুরু হলো ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান । এ জালিম ফ্যাসিবাদী সরকার রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য করে বেড়াতো। মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সুবিধাবঞ্চিত করতো। তার পছন্দের লোকদেরকে সকল সুবিধা ভোগ করাতো। ১০০% সরকারি চাকরির কোটার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেশিরভাগ কোটা রাখা হয়েছিলো। সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য তারচেয়ে বহুগুণ কম। অর্থাৎ মাত্র ২০% মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হতো আর বাকি ৮০% ছিল কোটা ভিত্তিক।

কোটার ক্ষেত্রে বৈষম্যতা দূর করতে শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনে নামে। কোটার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নয়। মেধাবীদের সুবিধাবঞ্চিত করা আর নয়। "বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে"-এর ব্যানারে সারাদেশের সকল শিক্ষার্থী এক হয়ে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

শুরু হয় এক নতুন বিপ্লব। দেশের এমন পরিস্থিতিতে অবৈধভাবে ক্ষমতার চেয়ার দখল করে থাকা রাষ্ট্রের প্রধান সংবাদ সম্মেলনে এসে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে। এতেই সকল ছাত্র জনতা ক্ষোভে ফুসলে উঠে। কোথায় তাদের এই ছোট্ট দাবী আদায় করবে, তা না করে তাদের বিপরীতে গিয়ে তাদেরকে 'রাজাকার' বলে সাব্যস্ত করছে। শুধু এটুকু করেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকর্মী আর তাদের দলের সন্ত্রাসী বাহিনীদের দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায়। গুলি করে কত প্রাণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এরা। হেলিকপ্টার দিয়েও আন্দোলনে আক্রমণ করেছে, আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নিহত আর আহতদের সংখ্যা হুরহুর করে বেড়েই চলছে। সারাদেশে কেমন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলছে এরা।

অবশেষে শিক্ষার্থীরা নয় দফা দাবী পেশ করে। এতে ছিল কোটা সংস্কারসহ এ হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত কয়েকজন সরকারি আমলাদের পদত্যাগের দাবী। কিন্তু ফ্যাসিবাদী জালিম সরকার কোনো দাবী নিয়েই মুখ খুলছে না। কোনো আশ্বাস দিচ্ছে না শিক্ষার্থীদের। তাদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করেই যাচ্ছে। আবু সাইদ, মুগ্ধসহ আরো কত শত তাজা প্রাণ কেড়ে নেয় এই রক্তচোষা

জালিম সরকার। আহতদের সংখ্যাও অগণিত। আর যাকে তাকে ধরে জেলে বন্দী করে রাখছে। এদিকে এসব খবর বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচার হচ্ছে বলে এ ফ্যাসিবাদী সারাদেশের ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কত মায়ের সন্তান নিহত হয়েছে এ সময়ে অথচ তারা খোঁজও পায়নি, কীভাবে কোথায় মারা গেলো তার কলিজার টুকরা সন্তান!

অবশেষে সারাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ দলমত নির্বিশেষে এ জালিম ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের দাবীতে এ মহা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

সকলের এক দফা এক দাবী! "স্বৈরাচার তুই গদি ছাড়বি"।

সারাদেশ থেকে লক্ষ্যাধিক মানুষ জালিমের পতনের জন্য রাজধানীতে অবস্থান করে। সকলের মুখে শ্লোগান একটাই। "দাবী মোদের একটাই, স্বৈরাচারীর পতন চাই"। কিন্তু এ জালিম ফ্যাসিবাদী সরকার কিছুতেই গদি ছাড়তে প্রস্তুত নয়। যেভাবেই হোক ক্ষমতা ছাড়া যাবে না, এমন প্রতিজ্ঞা করে হয়তো বসে ছিলো। প্রয়োজনে আরো রক্ত জড়াবে তবুও ক্ষমতা ছাড়তে রাজি না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুরা বানী ইসরাঈলে ইরশাদ করেন, "হে নবী! আপনি বলুন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, আর মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই"।

জুলুম করে কখনো কেউ পার পায়নি। আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেনই। হয়তো তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না।

সারা জুলাই মাস ধরে এ হত্যাযজ্ঞ চলে। কত রক্ত জড়ে পড়ে পিচ ঢালা রাস্তায়। কত মায়ের বুক খালি করা হয়। আবু সাইদ আর মুগ্ধসহ কত তাজা প্রাণকে কী নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়।

অবশেষে ৫ই আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচারী জালিম শাসক বাধ্য হয়ে, আর কোনো দিক নিশানা খোঁজে না পেয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নাকানিচুবানি খেয়ে ছাত্র জনতার কাছে পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। বিজয় হয় ছাত্র জনতার। পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকবার প্রমাণিত হলো, ছাত্র জনতার বিরুদ্ধাচারণ করে কেউ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। অথচ এতদিন গলা উঁচু করে বলে বেড়াতো,

উনি পালায় না। উনি কখনো পালাবেন না।

আল্লাহ এমনই করে থাকেন। সম্মান দান করেন যে আল্লাহ, আবার সম্মান ছিনিয়ে নিয়ে লাঞ্ছিত-বঞ্চিতও করেন সে আল্লাহ। কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। অন্য কেউ নয়। তিনি ইচ্ছে করলেই কেউ কোন না কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হতে পারে। নতুবা নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে নবী! আপনি বলুন: হে আল্লাহ্! আপনি হচ্ছেন রাজাধিরাজ। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। আপনারই হাতে সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান"। (সুরা আ'লে-ইমরান:২৬)

পুরো দেশের মানুষ আজ নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে৷ দীর্ঘ ষোলোটা বছর ধরে এক জালিমের শাসনে শসিত হওয়া জাতি আজ প্রশান্তির দীর্ঘ শ্বাস ফেলছে। পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত হয়েছে। গোটা জাতির লানত আর ঘৃণায় পরিনত হয়েছে সে জালিম স্বৈরাচারী শাসক। মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে এক স্বৈরশাসকের পতনের লজ্জিত সে ইতিহাস।

রক্তাক্ত এক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার এই রক্তাক্ত পথে ছিলো অনেক মায়ের কান্না, বাবার বুকফাটা আর্তনাদ আর অসংখ্য শহীদের জীবনের নজরানা।

শিক্ষার্থী: সাকতা জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

বাংলাদেশ একটি স্বপ্ন

বেলাল বিন জামাল

বাংলাদেশ একটি ভালোবাসার নাম। যে নামের সাথে মিশে আছে হাজারো ফুলের সুঘ্রাণ। প্রেম জড়ানো এই মায়ার বাগানে হরেকরকম মানুষের বসবাস। বৈচিত্রময় রুচি ও নানাবিধ চাহিদার সমাহার। সবশেষ তাদের মনবাগানে যে সুন্দর ফুলগুলো এখনো ফুটে আছে, তা হলো ইসলাম ও ঈমানের ফুল। যে ফুলের মাতাল করা ঘ্রাণে নাস্তিক-মুরতাদগণ আজও খুঁটি গেড়ে বসার সাহস করতে করেনি এবং পারবে না। কোনো স্বৈরাচার, দৌরাত্ম্য টিকতে পারেনি এবং পারবে না। এই বাংলার জমিনে যতদিন আছে ঈমান ও ইসলামের সামান্যটুকু আলো, কোনো অত্যাচারীর সাহস নেই তা ম্লান করা বা ক্ষমতা খাটানোর। বরঞ্চ এই নিভু নিভু আলোই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। যার চাক্ষুষ প্রমাণ এই বাংলার মাটি ও মানুষ।

আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত জুন মাসে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'স্বৈরশাসকের' পতন ঘটিয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে তরুণ প্রজন্ম। শিক্ষার্থী-আলেম-ওলামা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে বাধ্য হন ধর্মনিরপেক্ষ, ইসলাম বিদ্বেষী, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হাসিনা উন্নয়নের নামে মানুষের উপর দৌরাত্ম্যপনা ও জুলুম নির্যাতনের যে স্ট্রিমরোলার চালিয়েছে, তার ফলস্বরূপ আজকের এই লজ্জাকর পতন। এই মাটি কখনো কোনো অত্যাচারীকে মেনে নেয়নি; নেবেও না। শত শত তাজা প্রাণের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীনতা সে ঈমানেরই জ্যোতি, যার সামান্য আলোয় কেঁপে ওঠে অত্যাচারীর লৌহকপাট ও শাহি মসনদ।

বিজয়ের এই শুভক্ষণে আমরা চিরকৃতজ্ঞস্বরে স্মরণ করছি সেই মহান রব্বুল আলামিনকে, যিনি আমাদেরকে এই অত্যাচারী থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। দিয়েছেন বিজয় ও স্বাধীনতা। বিজয়ের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি একটি জাতিকে চিরউদ্যমে স্বাধীনতা উপভোগের পথ দেখায়। এক্ষেত্রে অন্যতম উৎসাহব্যঞ্জক উৎস

তরুণসমাজ ও তারুণ্যের বিজয় স্লোগান। বর্তমান প্রজন্মের চিন্তা, উদ্যম ও সাফল্যের মূল ভিত্তি দেশপ্রেম ও তরুণসমাজ। দেশপ্রেম একটি ঈমানি দায়িত্বও বটে। এই দেশের প্রতিটি বালু-কণায় যেমন মিশে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের ত্যাগ ও কুরবানি, তেমনই আছে তারুণ্যের বিজয় ও আশার বাণী। সেই নিভু নিভু আলো ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি এখনো আমাদের দিতে পারে চিরশান্তির সবুজ বাগান ইসলামি খিলাফাত। সেজন্য শুধু চাই একটু মেহনত, একটু চেষ্টা আর সাধনা।

সরকার পতনের পরপরই রাজধানীর পথে পথে নিপীড়িত গণমানুষের উল্লাসের রঙে রঙিন হয়েছে ৫ই আগস্টের স্মৃতিময় দিন। বিজয়ের এই মিছিলে বাদ পড়েনি কেউ। দিনমজুর, রিকশা চালক, ভিক্ষুক থেকে শুরু করে চাকুরিজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী গৃহিণী সবাই যুক্ত হয়েছেন উত্তাল রাজপথে। স্বৈরাশাসকের পতন ও ভারতীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত-স্বাধীন নতুন বাংলাদেশ পেয়ে তাদের এই উচ্ছাস। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত মানুষের আনন্দ-উল্লাস আর স্বাধীন স্বাধীন বলে গগনবিদারী আওয়াজে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। সকলেই এই সফল গণবিপ্লবের মহানায়ক শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছে। বলছে, এখন থেকে আমরা স্বাধীন। আমাদের তরুণরা দেশের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম। সক্ষম এই দুর্দশাগ্রস্ত উম্মতকে মুক্তির দিশা দিতে। অন্ধকারে নিমজ্জিত এই জাতিকে চিরসবুজ কল্যাণের পথ দেখাতে। ন্যায়, ইনসাফ ও খেলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। শুধু চাই চেষ্টা, মুজাহাদা আর কিছু নিবেদিত প্রাণ। আল্লাহ আমাদের সে বিজয়কেও ত্বরান্বিত করে দেন। আমিন।

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া তা'লীমুল কোরআন খালপাড়, নারায়ণগঞ্জ।

আম্মু, আমি শহিদ হবো

মো. আশিকুল্লাহ মাহমুদ

হুজাইফা দীর্ঘদিন পর ঈদের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। সবাই খুশিতে আত্মহারা, একদিকে ঈদের আনন্দ, আরেক দিকে সে দীর্ঘদিন পর বাড়ি এসেছে। হুজাইফা সবার ছোট, আবার পড়ে মাদরাসায়, তাই বাড়ির সবাই তার জন্য পাগল। সবাই এটা-সেটা জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু তাকে এবার একটু ভিন্নরকম মনে হচ্ছে। তেমন কথা বলছে না, যেকোনো প্রশ্ন করা হলে শুধু হ্যাঁ বা না বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। তেমন হাসিখুশিও না; এ অবস্থা দেখে সবারই মন খারাপ। এভাবেই ঈদ কেটে গেল, ছুটিও শেষের দিকে দু-এক দিন বাকি আছে। সে সবার ছোট, তাই বাড়িতে এলে সবসময় তার আম্মুর সাথেই ঘুমায়। আগামীকাল মাদরাসা খোলা, আজই শেষ রাত। আবার আসতে আসতে এক-দুই মাস পর হবে। তাই মা বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করছেন। হঠাৎ হুজাইফা বলে উঠল, আম্মু আমি শহিদ হবো। মা থমকে গেলেন তার কথা শুনে। কিছু বলছেন না। হুজাইফা বলছে, আম্মু আমি যদি শহিদ হই তাহলে তুমি তো আখেরাতে শহিদের মা হয়ে উঠবে। ভাইয়া, আপু শহিদের ভাই-বোন বলে দাবি করতে পারবে। এসব শুনে মায়ের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, শুধু অশ্রু ঝরা বাকি। মা বলল, কিরে বাবা এসব কী বলছিস। ঘুমিয়ে পড়ো আগামীকাল মাদরাসা খোলা, সকাল সকাল উঠতে হবে। এসব বলছে আর মায়ের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। হুজাইফা মায়ের চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, কেঁদোনা আম্মু, আমাকে হানজালা রাযি.-এর শহিদ হওয়ার ঘটনাটা একটু শুনাও। মা বললেন, আমি তো পারি না। সন্তানের বারবার পীড়াপীড়ির কারণে বললেন, মোবাইলে আছে, মোবাইল থেকে শুনে নাও। হুজাইফা কিছুতেই মানছে না; বলছে, আম্মু তোমার মুখ থেকেই শুনব। মা তো গ্রামের মানুষ তেমন ভালো করে পারেন না, তাই ছেলের পীড়াপীড়ির কারণে যা-ই পারতেন কোনরকম একটু বললেন।

এটা শুনে হুজাইফা বলল, আম্মু আমিও হানজালা রাযি.-এর মতো শহিদ হবো। মা এটা শুনে আবারও বললেন, এসব কী বলছিস ঘুমিয়ে পড়। এরপর হুজাইফা ঘুমিয়ে পড়ল, সকালে মা ডেকে উঠালেন এবং হালকা নাস্তা করালেন। মাদরাসায় যাওয়ার জন্য কাপড়চোপড় গুছানো, গোসল করা, এটসেটা করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। মা দুপুরের খাবার খাইয়ে মাদরাসার দিকে এগিয়ে দিলেন। এগিয়ে দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু অন্য দিনের থেকে কেমন যেন একটু ভিন্নরকম লাগছে, মনে হচ্ছে এটাই মনে হয় শেষ যাওয়া, আর মনে হয় যাবে না, আর মনে হয় ফিরবে না, আর মনে হয় আম্মু বলে ডাকবে না। এসব ভাবতে ভাবতে দু-চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। এতক্ষণে হুজাইফা চোখের আড়ালে চলে গেছে। মনে হচ্ছে শেষবারের মতো আরেকবার যদি একটু দেখতে পেতাম এ ভেবে উঁকি দিচ্ছেন, না দেখা যায় না। হঠাৎ মনে হলো-এসব কী ভাবছি! হুজাইফা আবার ফিরে আসবে। আর দেড় মাস পরেই পরীক্ষা। পরীক্ষার ছুটিতে বাড়ি আসবে এ বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল হুজাইফা চলে গেছে। আজ হঠাৎ এক অপরিচিত নম্বর থেকে তার মায়ের ফোনে কল আসলো। মোবাইলটা হাতে নিতেই গা শিউরে ওঠল তার। কিছুক্ষণ মোবাইলটা হাতে রেখে কল ধরল; কে যেন বলছে আপনি তো সৌভাগ্যবান, আপনার ছেলে দেশপ্রেমে শহিদ হয়ে গেছে। এটা শোনার পর তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। অঝোরে কাঁদতে থাকেন, মুখে কোনো কথা বের হয় না। ওপাশ থেকে বিভিন্ন সান্ত্বনার বাণী ভেসে আসে। শুধু একটি বাক্যই বারবার মুখে আসছিল তার, আল্লাহ তুমি আমার হুজাইফাকে জান্নাতে ভালো রেখো।

ময়মনসিংহ, সদর

শহিদ আবু সাঈদ: এক সাহসী তরুণের অমর কাহিনি

আব্দুল্লাহ মাসউদ

২০০১ সালের এক শীতল ভোরে, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ায় মকবুল হোসেন ও মনোয়ারা বেগমের ঘরে একটি ফুটফুটে সন্তানের জন্ম হয়। তার কচিমুখে হাসি ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের সবার মনে খুশির ঝিলিক বয়ে যায়। বাবা-মা তাকে স্নেহভরে নাম রাখেন-আবু সাঈদ। নয় ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট, আর তাই সবার আদরের মধ্যমণি। তার শৈশবের রঙিন দিনগুলো কেটেছে বাবনপুর গ্রামে, যেখানে প্রকৃতি আর সংস্কৃতির মধ্যে মিশে ছিল শৈশবের আনন্দ।

গ্রামের স্নিগ্ধতা আর মাটির গন্ধে বেড়ে ওঠা আবু সাঈদ ছিলেন মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্র। তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন। স্থানীয় জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপর খালাশপীর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি সম্পন্ন করেন এবং ২০১৮ সালে রংপুর সরকারি কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে এইচএসসি পাস করেন। ২০২০ সালে তিনি স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন, যেখানে তিনি নতুন আশার প্রদীপ হয়ে উঠেছিলেন।

আবু সাঈদ ছিলেন একটি বড় পরিবারের প্রাণ। তার বাবা-মা এবং ভাই-বোনেরা ছিলেন তার জীবনের প্রধান অনুপ্রেরণা, যারা তাকে পড়াশোনায় সবসময় সহায়তা করতেন। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতা তার পড়াশোনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি টিউশনি করে সংসার চালাতে হতো। তবুও তিনি কখনো স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি। তার মনের মধ্যে ছিল এক অজানা বেদনা, যা তাকে বারবার ভাবাত-কেন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে এত সংগ্রাম করতে হচ্ছে?

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন: আবু সাঈদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হলো ২০২৪ সালের কোটা

সংস্কার আন্দোলন। বাংলাদেশের ছাত্রদের এই আন্দোলন ছিল তাদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার প্রতীক। ২০১৩ ও ২০১৮ সালের পর, ২০২৪ সালের ৬ই জুন আবারো শুরু হয় কোটা সংস্কারের আন্দোলন, যেখানে আবু সাঈদ রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন। তার অদম্য সাহস আর নেতৃত্বে রংপুর অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে জেগে ওঠে।

১৫ই জুলাই, এক ঐতিহাসিক দিনে, তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক শামসুজ্জোহার স্মরণে এক আবেগঘন ফেসবুক পোস্ট করেন: 'স্যার! (মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা) এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার! আপনার সমাধি আমাদের প্রেরণা... অন্তত একজন 'শামসুজ্জোহা' হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।'

১৬ই জুলাই। দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটার দিকে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যখন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে, তখন আবু সাঈদ ছিলেন আন্দোলনের সম্মুখে। সবাই যখন ভয় আর আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছুটে গিয়েছে, আবু সাঈদ তখন পুলিশের বন্দুকের সামনে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে যান বুক চেতিয়ে। মুহূর্তেই পুলিশের ছোড়া গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তার বুক। একপর্যায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার জীবনের প্রদীপ নিভে যায়। তিনি শুধু কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম শহিদই হননি, তার মৃত্যু আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে।

আবু সাঈদের মৃত্যুতে গোটা দেশ শোকে মূহ্যমান হয়। তার স্মৃতিতে আন্দোলনকারীরা রংপুর পার্ক মোড়ের নাম পরিবর্তন করে 'আবু সাঈদ চত্বর' এবং রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের নাম 'শহীদ আবু সাঈদ গেট' রাখে।

কবি শহীদুল্লাহ ফরায়জী তার নামে একটি কবিতা লেখেন-'প্রজন্মের বীর আবু সাঈদ'। এই কবিতা আজও তার সাহসিকতার স্মৃতি ধারণ করে রাখে। আবু সাঈদের জীবন আমাদের শেখায়, কীভাবে একজন মানুষ নিজের স্বপ্নকে পূরণ করে সমাজের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

আব্দুল্লাহ মাসউদ

পড়াশোনা: আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

রক্তাক্ত বাংলাদেশ

উম্মুল বারাকাহ আমাতুল্লাহ শারমিন

রাত আনুমানিক এগারোটা। চারদিকে গোলাগুলির শব্দ। অস্ত্রের ঝনঝনানি চলছে। বারিরাহ কেঁদে কেঁদে কুরআন পড়ছে। পাশের একটি চেয়ারে উম্মে উসামা (বারিরাহ'র আম্মা) নিশ্চল বসে আছে। আবু উসামা অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। কখনো কখনো থমকে দাড়াচ্ছেন। রাস্তা থেকে ছাত্রদের আর্তনাদ ভেসে আসছে। উম্মে উসামা বারবার বলছে, আমার ছেলে! আমার ছেলে উসামাকে তারা রাস্তায় কেটে টুকরো টুকরো করতেছে। আমার ছেলেকে ওরা মেরে ফেলল। উসামা, আমার উসামা!

বারিরাহ ডুকরে কেঁদে ওঠে। এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল। আবু উসামা বললেন সম্ভবত উসামা এসেছে। বারিরাহকে দরজা খুলে দিতে বললেন।

উম্মে উসামা: না বারিরাহ, তুমি দরজা খোলো না। উসামা আসেনি। ওরা এসেছে। ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবে।

দরজা খুলতে গিয়ে বারিরাহর হাত থেমে যায়। উসামা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। গতকাল রাতে কথা বলেছিল। আর কথা বলেনি। বারিরাহ কান্না আটকাতে পারে না। আবারও কলিংবেল বেজে উঠল। আবু উসামা দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করল এক অপরিচিত যুবক।

আবু উসামা: এই এই তুমি কে?

যুবক: বাবা, আমাকে বাঁচান। আমি স্টুডেন্ট। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

অপরিচিত যুবক ঘরে প্রবেশ করায় বারিরাহ ও উম্মে উসামা মা-মেয়ে দুজনই তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে নিজেদের আবৃত করে নিল।

আবু উসামা: বাবা, তুমি আমার ছেলে উসামার মতো। আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম। এ ঘর তোমার জন্য নিরাপদ। আমি থাকতে তোমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

যুবকের ভয়ার্ত দৃষ্টি। শরীরে অনেকগুলো জখম। আবু উসামা সেগুলো পরিষ্কার করে ঔষধ লাগিয়ে দিলেন। যুবককে নিয়ে আবু উসামা পাশের ঘরে চলে গেলেন। একটু পর আবার কলিংবেল বেজে উঠল, সাথে

দরজার সামনে অনেকগুলো লোকের ভিড়। আবু উসামা যুবককে আশ্বাস দিলেন যে, তারা কিছুই করতে পারবে না।
বারিরাহ নিঃশব্দে কাঁদছে। আবু উসামা যুবককে ঘরের মধ্যে রাখা নিরাপদ নয় বলে বাথরুমে লুকিয়ে রেখে আসলেন। দরজা খুলে শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনারা কী চান? কী সমস্যা? দরজা ধাক্কাচ্ছেন কেন?

পুলিশ: ঘরে কি ছাত্র আছে?
ছাত্রলীগ: স্যার, এভাবে ভালো কথায় এইলোক শুনবে না। আমরা দেখেছি এই ঘরে ছাত্র ঢুকেছে।
আবু উসামা: দেখুন স্যার, ঘরে আমার স্ত্রী এবং কন্যা আছে। তারা উভয়ই পর্দানশিন, তাই আমরা দরজা বন্ধ করে রাখি। ঘরে ছাত্র থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না।
পুলিশ ও ছাত্রলীগ: আপনি সরে দাঁড়ান। আমরা তল্লাশি করব।
আবু উসামা: জ্বি স্যার আসুন। তল্লাশি করুন। কিন্তু সবাই ঢুকবেন না। কেননা তাতে আমার স্ত্রী, কন্যার অসুবিধা হবে।

ছাত্রলীগ হইহই করে উঠল। বলল: আরে রাখ মিয়া তোর পর্দানশিন! আমরা সবাই ঢুকব।

পুলিশ: আপনার মেয়ে কোথায় পড়াশোনা করে?
আবু উসামা: মহিলা কামিল মাদরাসায়।
ছাত্রলীগ: বুঝেছি একটা জঙ্গি ঘরে আছে।
বারিরাহ, উম্মে উসামা অবস্থা ভয়ানক দেখে তাড়াতাড়ি বোরকা হিজাব পরে নিল। বারিরাহ কুরআন পড়তে লাগল। ছাত্রলীগ আবু উসামাকে এক ধাক্কায় নিচে ফেলে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। আবু উসামা ভাবতে পারেনি তার এলাকার ছেলেরা এভাবে তার গায়ে হাত তুলবে। অথচ এদেরকে তিনি আপন ছেলের মতো স্নেহ করতেন। তারা বারিরাহকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। আবু উসামা সহ্য করতে পারলেন না।

যে ছেলেটি বারিরাহর গায়ে হাত দিয়েছিল তাকে ঘুসি মারল। এতে উপস্থিত নরপিশাচগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে আবু উসামার উপর চড়াও হলো। একজন বল্লম দিয়ে আবু উসামার গর্দানে আঘাত করল। উম্মে উসামা চিৎকার দিয়ে আবু উসামার বুকের উপর আছড়ে পড়লেন। আবু উসামা শেষবারের মতো বললেন, আমায় ক্ষমা করে দিস মা! বিশটা বছর তোকে আগলে রেখেছি, কোনো পরপুরুষ তোর মুখ দেখেনি। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কালেমা

পড়তে পড়তে নীরব হয়ে গেলেন। এই নরপিশাচগুলো মায়ের বয়সি একজন মহিলাকেও রেহাই দিলো না। তারা বারিরাহর সামনে তার মাকে ধর্ষণ করল।

আহ পৃথিবী! আহ বিশ্ব মানবতা! আহ বিশ্ব বিবেক! মা-মেয়ের আর্তনাদে পৃথিবী কম্পিত। আল্লাহর লানত পড়ুক এই নরপিশাচদের উপর। অপরিচিত যুবক জানতো না এতকিছু হয়ে গেছে। সে চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে উম্মে উসামা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বারিরাহ তার পিতা-মাতার রক্তে রঞ্জিত। বারিরাহর বোরকা হিজাব খুলে নিয়েছে নরপিশাচরা। তার জামা ছিন্নভিন্ন, মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে। কুরআন রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। সেই যুবক একটি ছুরি নিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে এসে সর্বশক্তি দিয়ে এক নরপিশাচের গর্দানে আঘাত হানে। এক আঘাতেই নরপিশাচের মস্তক দ্বিখণ্ডিত।

কিন্তু আরেক নরপিশাচ সেই যুবকের পিঠে ছুরি দ্বারা আঘাত করল। পরপর কয়েকবার আঘাত করার কারণে সেই যুবক আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নরপিশাচগুলো সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে বারিরাহকে নিয়ে চলে গেল। আহ মানবতা! মাজলুমের আর্তনাদ আর জালিমের উল্লাসে পৃথিবী প্রকম্পিত। বাড়িতে জায়গায় জায়গায় লেগে আছে রক্তের দাগ। তাজা তিনটা লাশের রক্তে ভেসে যাচ্ছে এ বাড়ির আঙিনা। স্বৈরাচার শুষে নিচ্ছে হাজারো নিরীহ মানুষের রক্ত। সারা বাংলায় রক্তের বন্যা বইছে। বাংলার সবুজ মাঠ আজ যেন রক্তে লাল হয়ে গেছে। এ যেন পৃথিবীর বুকে এক রক্তাক্ত ভূখণ্ড! এক রক্তাক্ত বাংলাদেশ!

ওদিকে উসামা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছিল। সে ভাবতে পারেনি তার পরিবারে কেউ হামলা করবে। দুদিন কেটে গেছে ব্যস্ততার কারণে সে বাড়িতে কথা বলতে পারেনি। আজ কয়েকবার ফোন দিল কিন্তু বাড়ির প্রত্যেকের ফোন বন্ধ। সে ভেবে নিল হয়তো কোনো সমস্যা তাই ফোন বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার বাড়ি দূরে হওয়ায় সে কখনো বাড়িতে যাওয়ার কথা চিন্তাও করল না। এক সপ্তাহ হলো প্রতিবেশীরা আবু উসামা, উম্মে উসামা এবং সেই যুবককের লাশ দাফন করেছে কিন্তু উসামাকে কেউ একটাবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

উসামা এক সপ্তাহ পর বাড়িতে এলো। প্রতিবেশীরা তার চারদিকে ভিড় করতে লাগল। কিন্তু উসামার বাবা-মা এবং বোন কোথায় কেউ বলল না। সবাই নীরব। শেষে উসামার দুঃসম্পর্কীয় এক

চাচাতো ভাই বলল তার বাবা-মা সহ এক অপরিচিত যুবককে মেরে ফেলা হয়েছে। বারিরাহকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। সব শুনে উসামা বলল, আমি আমার বোনকে নিতে যাচ্ছি। যারা মাজলুমের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করে আনন্দিত হয়, যারা রক্তের হলি খেলতে ভালোবাসে। সেই রক্তখেকোদের বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করব।

সে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলল, হে আল্লাহ, আমি ইসলামের জন্য, খিলাফতের জন্য, সকল জুলুমের বিরুদ্ধে, সকল জালিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি এই জালিমদের বিরুদ্ধে লড়ব। এই তিতুমীরের ভূমিতে, শাহজালালের ভূমিতে হয়তো শরিয়াহ কায়েম হবে, নয়তো আমি শহিদ হবো। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে শক্তি দিন।

এরপর সে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে রক্তাক্ত বাংলাদেশের কোনো এক পথে অন্ধকারে চলতে চলতে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

শিক্ষার্থী, নগরাজপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

“নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয়া খুব সহজ। নিজেকে মানুষ বলে প্রমাণ করা খুব কঠিন, আর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে মানুষ পরিচয়ের স্বীকৃতি লাভ করা আরো কঠিন। নিজের স্তর তুমি নিজেই নির্ধারণ করো।”

করলে যারা ঋণী

কাজী মারুফ

দেশ বাঁচাতে লড়াই করে
করলে যারা ঋণী,
তোমাদের এই ত্যাগের কথা
ভুলব না কোনোদিনই।
বিনিময়ে রক্ত, প্রাণের
করলে পতন স্বৈরাচারের
আনলে বিজয় ছিনি।

তোমরা ছিলে অকুতোভয়
সাহস ছিল বুকে,
কলুষমুক্ত করলে স্বদেশ
স্বৈরাচারী রুখে।
পেয়েছি নিজ স্বাধীনতা
মন খুলে আজ বলব কথা,
পারবে না আর দেশকে নিয়ে
খেলতে ছিনিমিনি।

মুগ্ধ সাঈদ তাহমিদ আসিফ
ফারহানেরই মতো,
দেশের জন্য জীবন দিলো
আরো কতশত।
তাদের কথা যাইনি ভুলে
করছি দোয়া হৃদয় খুলে,
বিজয়ের চব্বিশ দেখেছি
একাত্তর দেখিনি।

শহীদ আবু সাঈদ জাগো

জিয়া হক

আমার টাকায় গুলি কিনে ঝাঁঝরা করিস আমার বুক,
ন্যায্য দাবি চাওয়া-পাওয়ায় রক্ত ঢালিস ক্যান উল্লুক।

মুষ্ঠিবদ্ধ কোটি হাতের শক্তি কত বুঝিস না?
লাশের পরে লাশ ফেলে আর দমানো পথ খুঁজিস না।

ছাত্রসমাজ মানেই মিসাইল এটমবোমা হাইড্রোজেন,
বিজয় বিনে বিকল্প নাই, নাই পরাজয় নাই ড্রো যেন্।

ঘরে ঘরে শহীদ আবু সাঈদ জেগে উঠবে শোন,
পাথর পাহাড় ভস্ম করে পুষ্প হয়ে ফুটবে শোন।

স্বাধীনতার চেতনাকেই লালন-পালন চাস যদি,
পান থেকে চুন খসলে কেন করিস সর্বনাশ 'বদী'।

কত্ত মায়ের বুক খালি আজ বিষফোঁড়া ওই কোটাতে,
বুদ্ধিজীবী শুয়োরগুলো মুখ গুঁজেছে লোটাতে।

ভার্সিটিতে পুলিশ কেনো, লীগের হাতে রক্ত ক্যান,
আমার বোনের জায়নামাজে যুদ্ধ যুদ্ধ অক্ত ক্যান!

ন্যায্য অধিকারের লড়াই- বিজয় মুকুট চাইরে চাই,
শহীদ আবু সাঈদ জাগো ঘুমের সময় নাইরে নাই।

নতুন বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আফজাল হোসেন মাসুম

রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে
উঠল জেগে জাতি,
রক্ত দিয়ে জয় ছিনিয়ে
উৎসবে সব মাতি।

দেশ বাঁচাতে সবাই এলো
উঠলো বেজে তূর্য,
নতুন ভোরে নতুন করে
উঠল নতুন সূর্য।

নতুন করে লিখতে হবে
ইতিহাসের পাতা,
ইতিহাসের মহানায়ক
এই ছাত্র-জনতা।

সবাই মিলে গড়বো এবার
দেশের মত দেশ,
বিশ্ব দেখবে অবাক চোখে
নতুন বাংলাদেশ।

আয়নাঘর

মুহাম্মদ মুকুল মিয়া

ফিরে পেলাম স্বাধীনতা
ফিরে পেলাম দেশ,
আয়নাঘরে বন্দি ছিলো
আমার বাংলাদেশ।

অযুত-নিযুত- হাজার-হাজার
ছিলো শুধুই লাশ,
দেখলে পড়ে আটকে আসে
আমার-ই নিঃশ্বাস।

হায়রে আমার স্বাধীনতা
হায়রে আমার দেশ,
অন্ধকারেই বন্দি ছিলো
সোনার বাংলাদেশ!

গুম হওয়া সব স্বজনগুলো
ফিরবেনাতো আর,
বুকে আমার ক্রোধের অনল
জ্বলছে হাহাকার।

আয়নাঘরের মতো এমন
ভয়াল কিছুই নাই,
সত্যিকারের স্বাধীনতা
আজও খুঁজি তাই।

তারুণ্য আসছে ত্যাজি

জুনাইল বাশার

মানচিত্রে দেখ শকুনের তাবা পতাকায় ভাইয়ের খুন,
বারুদ বুকে জনতার ঢল ক্রমেক্রমে শত সহস্র গুণ।

একটি প্রাণও বৃথা যাবে না আটকাবো না বাঁধায়,
ন্যায্য দাবী চাইতে এসেছি করবোই তা আদায়।

দেশের জন্য দিতে পারি প্রাণ, ধরি স্বপ্ন বাজি,
দেখ পৃথিবী, দেখ চেয়ে তারুণ্য আসছে ত্যাজি।

শিকল আজ হবে বিকল ভাঙবে রে রাজ তালা,
সৈরাচার আজ পথ খোঁজে নে জীবন থাকতে পালা।

খুন-গুম আর বুলেট- বোমায় দাবায় রাখতে পারবা না,
রক্ত দিয়ে দেশ পেয়েছি, দেশটা কারও বাবার না।

পেতেছ এক মরণ খেলা, পদে পদে করছো ভুল,
আসছে সময় দিতে হবে মানুষ মারার সুদ- মাশুল।

জামানার ছাত্র

মেরাজুল ইসলাম

ছাত্র মোরা সবটা পারি
রুখতে পারি কালো,
অসংগতির আঁধার ঠেলে
জ্বালতে পারি আলো।

সদ্য ফোঁটা চারা গাছে
আনতে পারি কুঁড়ি,
এক নিমিষেই বাজতে পারি
জোয়ার বাটায় তুরি।

আকাশ ভেঙে আনতে পারি
আষাঢ় কালো মেঘ,
হাতের মুঠোয় আনতে পারি
জয় ছিনিয়ে দেখ্।

চুপটি করে রই না পরে
যেমন নদীর দ'কূল,
অভয় প্রাণে লড়াই করে
দুশমনে নিই উসুল।

ঝড়ের বেগে আনতে পারি
ঈশান কোণে বায়ু,
মরুর বুকে জাগতে পারি
নীরস প্রাণে আয়ু।

মুক্ত হাতে দেশটা মোদের
রাখতে পারি সচল,
এই জামানার ছাত্র মোরা
প্রতিজ্ঞা বেশ প্রবল।

নতুন বাংলাদেশ

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

রক্ত দিয়ে নতুন করে
কিনতে হলো মুক্তি,
সবাই মিলে এবার তবে
করি নতুন চুক্তি।

দুর্নীতি নয় দুষ্কৃতি নয়
নতুন বাংলাদেশে,
নতুন করে স্বপ্ন দেখি
গড়বো নতুন বেশে।

আর না ঝরুক রক্ত কারো
আর না হারাক প্রাণ,
দেশকে সবাই আপন ভেবে
রাখবো দেশের মান।

গদি ছাড়

কালিমুল্লাহ বিন ইব্রাহীম

কতকাল আর থাকবি বসে
বাংলাদেশের গদিতে,
লজ্জা যদি মোটেও থাকে
ঝাঁপ দিয়ে মর নদীতে!

শরম-বরম সব খেয়েছো
ধুয়ে দেশের পানিতে,
জনগণকে বানাও বোকা
আজগুবি সব বাণীতে!

সেই সুযোগ আর পাবি নাতো
বাংলাদেশের মাটিতে,
দেশ ছেড়ে আজ শুরু কর তুই
ভারত পথে হাঁটিতে!

রক্তে লাল

সোলায়মান হোসেন সুমন

চাওয়ার চলে পাওয়ার বলে
চেয়েছি ন্যায্য অধিকার,
নিজের দেশে ছাত্রের বেশে
উপাধি হলো রাজাকার।

আয়রে তরুণ আয়রে অরুণ
মাষ্টার দা সূর্য সেনের দল,
মশাল জ্বালো শ্লোগান তুলো
প্রীতিলতা অগ্নি মনো বল।

বরকত দেখেনি আসিফ দেখেছি
সালামের মতোই বীর,
বায়ান্ন দেখিনি চব্বিশ দেখেছি
আবু সাইদ উচ্চ শির।

ছাত্রের ঠোঁটে বুলেট ফোটে
আগুন ঝরা দ্রোহকাল,
গণতন্ত্র গেছে রণতন্ত্র নেচে
স্বদেশ মাটি রক্তে লাল।

দেশটা আবার স্বাধীন হলো

মাহদী হাসান ফরাজী

একাত্তরে যুদ্ধ হলেও
হয়নি স্বাধীন আমার দেশ,
বাড়ছে কেবল জুলুম, ঘৃণা,
জিঘাংসা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ।

জুলুম যখন তীব্র হয়ে
কোটার রূপে গিলছে সব,
ধৈর্যসীমার বাঁধ ভেঙে ফের
ছাত্র সমাজ তুলছে রব।

কোটানীতির সংস্কারে
বৈষম্যের কবর হোক,
মেধা-জ্ঞানে চাকরি পাবে
নাতিপুতি ও সকল লোক।

স্বৈরাচারীর ক্ষোভ বেড়ে যায়,
ক্রোধে ফেলে মেধার লাশ,
প্রভু ভক্ত কুত্তার দিয়ে
জাতিকে দেয় কৈঞ্চা বাঁশ।

বুক চিতিয়ে সাঈদ বলে
যতো পারিস গুলি কর,
লক্ষ্য সাঈদ শহীদ হলেও
থামবে না এই যুদ্ধ ঝড়।

মূর্খ পুলিশ চালায় গুলি
যুদ্ধ আরো তীব্র হয়,
বিপ্লবীরা যায় না দমে
বাড়তে থাকে ধ্বংস ক্ষয়।

শিশু, যুবক, বৃদ্ধা ও নারী
বুলেট বিদ্ধ পাইছে চোট,
ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক,
আমজনতা বাঁধছে জোট।

রক্ত যখন ঝরেই গেছে
মুক্ত হবেই বাংলাদেশ,
ক্ষোভের দ্রোহে জ্বলে পুড়ে
স্বৈরাচারী হবেই শেষ।

রক্ত, খুনে দেশ ভাসিয়ে
হার মানে ফের জুলুমবাজ,
চব্বিশের বীর ছাত্র সমাজ
মাথায় পড়ে বিজয় তাজ।

লাল সবুজের বাংলা থেকে
পালিয়ে গেলো স্বৈরাচার,
দেশটা আবার স্বাধীন হলো,
মুক্ত হলো দখলদার।

ছাত্র সমাজ শিখিয়ে গেলো-
বুক চিতিয়ে যুদ্ধ করা,
দাসত্বে নয়, বিপ্লবে হয়
সম্প্রীতিময় স্বদেশ গড়া।

আয়না ঘর

শারমিন নাহার ঝর্ণা

আয়না ঘরের কথা এবার হলো উন্মোচন
আয়না ঘরের গল্প শুনে শিহরে ওঠে মন,
বন্দী ছিল কত যে মানুষ নির্মম ইতিহাস
একদিন হয়তো মুক্তি পাবে ছিল বিশ্বাস।

আয়না ঘরের দেওয়ালে যে দুঃখ ছিল আঁকা
মনের ভেতর কষ্ট তাদের বুকটা ছিল ফাঁকা,
দু'চোখ জুড়ে ঘন আঁধার আর স্বপ্ন ভাঙ্গা মন
নিঃসঙ্গ নিষ্ঠুর সময় আর বিষাদে ভরা জীবন।

আর যেন হয় না কারো নিষ্ঠুর এমন জীবন
এ যেন ভয়ংকর খাঁচা বেঁচে থেকে ও মরণ,
এমন নিপীড়ন অত্যাচার আর যেন না হয়
বাঁধার শিকল ছিন্ন করে আনতে হবে জয়।

তারুণ্যের তপ্ত নিঃশ্বাস
ইবনে সিরাজ

অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে,
তারুণ্যের তপ্ত নিঃশ্বাসে জ্বলে ওঠে
গণমানুষের বিদ্রোহের দীপ্ত শিখা,
পিচঢালা পথে ছড়ায় রক্ত-লাল স্পন্দন,
শাসকের সিংহাসন কেঁপে ওঠে ভয়াল
বজ্রনিনাদে।

চাপা কান্না আর শিকলবাঁধা স্বপ্নের-
দিন শেষ হয়ে যায়,
বক্ষ ফাটিয়ে ওঠে জনতার কলরব,
প্রাচীর ভেঙে সমুদ্রের মতো গর্জে ওঠে
তরুণতা।
হিমশীতল রাত্রির অবসানে,
রক্তিম প্রভাতের সূর্যোদয়ে,
জন্ম নেয় স্বাধীনতার নবধারা-
শতাব্দীর শাসন তুচ্ছ করে
তরুণের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়
নিপীড়কের লৌহ প্রাচীর।

নতুন বাংলাদেশ, মুক্ত স্বাধীন,
ভারতীয় আধিপত্যের শেকল ভাঙা স্বপ্নে
তারুণ্যের জাগ্রত মিছিল,
জ্বলে ওঠে মুক্তির সাদা ধোঁয়ায়-
মায়ের মাটি ফিরিয়ে নেয় তার সোনার
সন্তানদের।

এই পথ, এই পাথর, এই আকাশ
স্মরণ করবে ঐতিহাসিক সেই মুহূর্ত,
যখন বাংলার বুকে গর্জে উঠেছিল
তারুণ্যের উন্মত্ত বজ্রনিনাদ,
যখন প্রতিটি হৃদয় বেঁধেছিল এক নতুন
শপথ, যে শপথে মিশে আছে
সাহসিকতার সুর, স্বাধীনতার মন্ত্র, এক
নবীন পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি।

এই শপথ রচিত হয়েছে রক্তের
অক্ষরে,
যার প্রতিটি শব্দে বাজে বিজয়ের
শঙ্খধ্বনি,
যার প্রতিটি বর্ণে জ্বলে ওঠে তারুণ্যের
দুর্জয় শৌর্য।
বাংলার এই মুক্তির গান, এমন এক
গান, যা কখনো থামবে না,
এই জাগরণ, এমন এক জাগরণ,
যা প্রজন্মের পর প্রজন্মের বুকে জ্বলবে-
চিরকালীন, চিরজাগ্রত ও অপরাজেয়।

গণমানুষের উচ্ছ্বাস

আতাউর মালেক

পনের বছর স্বৈরাচারের
কী ক্ষমতা দেখে,
দেশের মানুষ অতীষ্ট খুব
যায় জনগন বেঁকে!

চাকুরি পায় না ছেলে-মেয়েরা
কোটার প্রাদুর্ভাবে,
টাকা ছাড়া হয় না কিছুই
সচ্ছতার অভাবে!

কথা বলার স্বাধীনতা নাই
কথায় কথায় গুম,
এই জনগন স্বস্তিতে নাই
নেয় যে কেড়ে ঘুম!

আন্দোলনের ডাক এলো যেই
জনতাও সোচ্ছার,
প্রতিবাদের ঢেউ চারিদিকে
মানতে নারাজ হার!

এই জনগন পারবে এতো
পায়নি ওরা আঁচ,
বিজয় এনে এই জনতার
দেখছি কী উচ্ছ্বাস!

তারুণ্যের আগুন

শরিফ আহমাদ

বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ
তারুণ্যের এক আগুন,
স্বৈরাচারীর লিখতে পতন
আওয়াজ তোলে জাগুন ।

গর্জে উঠে দেয় দেখিয়ে
দিন বদলের চমক,
ভয় করে না বুলেট বোমা
পাতি নেতার ধমক ।

গ্রাম শহরে প্রতিরোধের
দেয়াল তুলে দাঁড়ায়,
স্বৈরশাসক যায় পালিয়ে
সামনে কদম বাড়ায় ।

দেশ গঠনে হাত দিয়েছে
হৃদয় ছোঁয়া দৃশ্য,
ছাত্রদের ত্যাগ বিজয় দেখে
অবাক এখন বিশ্ব ।

চব্বিশের দেশপ্রেমিক

মো. শরিফুল ইসলাম

আমি বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন দেখিনি,
দেখিনি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান,
দেখিনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে
ঝরে যাওয়া অজস্র প্রাণ।

আমি দেখিনি একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ
দেখিনি কাছে থেকে মৃত্যু গ্ৰাস,
আমি দেখিনি দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর
ষোলই ডিসেম্বরের বিজয় উল্লাস।

আজ আমি দেখেছি চব্বিশের ছাত্র সমাজ
কতটা দুঃসাহসী, ওরা যে দামাল সন্তান,
দেখেছি চব্বিশের প্রজন্ম কতটা
অকুতোভয়
দেখেছি দুর্নিবার যোদ্ধাদের উত্থান।
আমি দেখেছি এই বাংলার বুকে নতুন
প্রজন্মের
ঐতিহাসিক এক গণজাগরণ,
ছাত্র সমাজের ডাকে ছুটে এসেছেন কবি
লেখক
বাংলার সর্বস্তরের জনগণ।

আজ আমি দেখেছি স্বৈরশাসক হটিয়ে
কিভাবে করেছে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার?

আজ আমি দেখেছি, যদি থাকে অটুট
দেশপ্রেম
পাড়ি দেওয়া যায় দূর্গম গিরি কান্তার।

আজ আমি দেখেছি এই বাংলার বুকে
বিজয় উল্লসিত ছাত্র জনতার,
আর নয় সংঘাত আর নয় হত্যাযজ্ঞ
এসো দেশ গঠনে করি অঙ্গীকার।

৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আলেম শহিদ

মাহমুদুল হাসান মাহদী রহ.

●বিন ইয়ামিন সানিম

৪ই আগস্ট, রবিবার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে স্বৈরাচারী সরকার পতনের 'একদফা' দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সর্বস্তরের জনগণ, আলেমসমাজ ও তাওহিদি জনতা দেশের রাজপথগুলো প্রকম্পিত করে তোলে। সারা দেশে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জীবন হারান কমপক্ষে ১০৪ জন। আহত হন সহস্রাধিক। সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়। এ ছাড়া তিন দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় আদালতের কার্যক্রম। ঢাকার সাথে সারাদেশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মোবাইলের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অপরদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কারফিউ প্রত্যাখ্যান করে ছাত্র-জনতার উপর হামলা, গুলি ও হত্যার প্রতিবাদে "লং মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচি একদিন এগিয়ে এনে ৫ই আগস্ট করার ঘোষণা দেয়।

৫ই আগস্ট, সোমবার। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজপথে বাড়তে থাকে গণমানুষের জমায়েত। দুপুর নাগাদ ঢাকার রাজপথগুলো গণজোয়ারে পরিণত হয়। কারফিউ উপেক্ষা করে গণভবন অভিমুখী লংমার্চে গাজীপুর থেকে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দেন মাহমুদুল হাসান মাহদী রাহ.। দুপুরে ঢাকা মহাখালীর আইপিএইচ রোডে অবস্থিত জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের সামনে আরটিভিতে তাকে সাক্ষাৎকার দিতে দেখা যায়। তিনি বারবার তর্জনী আঙুল উঁচিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে ঘোষণা করছিলেন-আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই। এদিন মহাখালীর কোনো একটি স্থানে জীবনের সর্বশেষ লাইভে এসে শেখ হাসিনা পতনের ব্যপারে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন। সেদিন উত্তরা থানা এলাকায় বিকেল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। বিজয়-মিছিল শেষে গাজীপুর ফিরে যাওয়ার সময় সন্ধ্যায় পুলিশের গুলিতে মাহমুদুল হাসান মাহদীও উত্তরায় গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একটি বুলেট

তার বুকের বাম পাশে লেগে বেরিয়ে যায়। মাহদীকে উদ্ধার করে প্রথমে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করা হয় ।কিন্তু অপারশনের পরও রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়নি। পরের দিন সন্ধ্যায় তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন ।মাহদীর পরিবারের একমাত্র ভরসা ও আলো নিভে যায় চিরতরে। মুহূর্তের মধ্যেই তার পরিবারের সকল আনন্দ ও কোলাহল থেমে যায়। পরিবার ও স্বজনদের কান্না ও আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে পরিবেশ। প্রথমেই তার লাশ নিয়ে আসা হয় বারিধারা মাদ্রাসায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সহপাঠী ও অন্যান্য পরিচিত আলেম-ওলামারা জড়ো হোন। সবার মুখে মাহদীর প্রশংসা। তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্বল, অন্তত মিশুক এবং পরিপাটি একজন মানুষ। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। নামাজে যখন সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তার তিলাওয়াত শুনতো। ওয়াজের ময়দানে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধীকারী ছিলেন।

জন্মও ও বেড়ে ওঠা, শিক্ষা ও কর্মজীবন: শহিদ মাহমুদুল হাসান মাহদী রাহ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাফেজ আব্দুস সাত্তার, ও মা উম্মে কুলসুম।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায় ছোট্ট একটি চাকরির সুবাদে তার বাবা ঢাকার আব্দুল্লাহপুরে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিন ছেলে এক মেয়ের মধ্যে মাহদী সবার বড়। মাহদী প্রথমে ঢাকার বারিধারায় একটি মাদ্রাসায় কুরআন হিফজ করেন। অতঃপর রাজধানীর বেশ কয়েকটি মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। এবং কুড়িলের শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার থেকে দাওরায়ে হাদিস তথা মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। সর্বশেষ ঢাকার পূর্ব রামপুরার জামতলায় অবস্থিত জামিয়াতুল আসআদ আল ইসলামিয়া থেকে ইফতা পড়েন। মাহদীর পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তাই সংসারের হাল ধরতে চাকরির সন্ধানে নেমে পড়েন। গাজীপুর কাপাসিয়ায় ভাওয়াল চাঁদপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পেশ ইমাম হিসেবে যোগদান করেন। মাহদির মাসিক ১০-১২ হাজার টাকার রোজগারে মা-বাবা দুজনের মুখেই ফুটেছিল সুখের হাসি।

দুই বছর আগে ফাতেহপুর গ্রামের বুশরা খাতুনের সাথে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হোন মাহদী। স্ত্রী বুশরা শ্বশুর শাশুড়ির সাথে আব্দুল্লাহপুরে থাকতেন। মাঝেমধ্যে কাপাসিয়া থেকে পরিবারের খোঁজখবর নিতে বাসায় আসতেন মাহাদী। গত ৯ মাস আগে এ দম্পতির কোল জুড়ে আগমন করে ফুটফুটে একটি ছেলে সন্তান। নাম রাখা হয় হুজাইফা। মাহদী সময় অসময়ে সন্তানের ছোঁয়া পেতে বাসায় ছুটে আসতেন। হুজাইফাকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে চুমু দিতেন। আব্বু আব্বু বলে আদরে মাতিয়ে তুলতেন। পিতার স্পর্শে শিশু হুজাইফাও হাসতো মন খুলে। পিতা পুত্রের ভালোবাসায় ভাসতো গোটা পরিবার। হুজাইফা জানেনা চিরতরে হারিয়ে গেছে বাবার স্পর্শ। তাকে আর বাবা'র কণ্ঠে ভেসে আসা 'আব্বু আব্বু' বলে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে চুমু দেবে না কেউ।

গত বুধবার তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় সরাইলের ফতেহপুর গ্রামে। মাহদীর অনাকাঙ্ক্ষিত নির্মম মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা ফাতেপুর গ্রামে। এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শত শত গ্রামবাসী মাহদীর মরদেহকে এক নজরে দেখার জন্য ভিড় জমান। মাহদীর একমাত্র সন্তান হুজাইফা পিতার মুখে বারবার হাত দেওয়ার চেষ্টা করছিল আর হাসছিল। কিন্তু কলিজার টুকরা সন্তানের সেই ডাকে কোনো উত্তর দেওয়ার সুযোগ তো এখন আর নেই মাহদীর। স্ত্রী বুশরা আর মা উম্মে কুলসুম চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাচ্ছিলেন কিছুক্ষণ পরপর।

তার মা কান্না আহাজারী আর বিলাপ করে বলছিলেন, স্বামীর পর পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিল আমার কলিজার টুকরা মাহদী। এখন আমার পরিবারের কী হইব? একমাত্র আদরের ধন শিশু হুজাইফাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কে আর আব্বা বলে ডাকবো? পিতা কী তা বোঝার আগেই এতিম হয়ে গেল আমার দাদা ভাই। আমি এখন কী নিয়া বাচমু?

মাহদীর পিতা হাফেজ আব্দুস সাত্তার বলেন, অনেক কষ্টে ছেলেকে হাফেজ মাওলানা ও ইফতা পড়িয়েছিলাম। একজন হাফেজের বুক ছিদ্র করতে তাদের হাত কি একটুও কাঁপল না? পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিল মাহাদী। আমার নাতি পুত্রবধূসহ গোটা পরিবারের এখন কী হবে? পুলিশ বা রাষ্ট্র কি আমাদের দায়িত্ব নেবে? আমি সবকিছু আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম।

গত বুধবার মাগরিবের নামাজের পর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে মাহদীকে দাফন করা হয়। এভাবেই একজন সম্ভাবনাময় উদীয়মান তরুণ আলেমে দ্বীনের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

নির্বাহী সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

২৪ এর গণঅভ্যুত্থান: কিছু কথা, কিছু ব্যাথা

যাইদ আল মারুফ মাসুদ

৬৯এর গণঅভ্যুত্থানে যেমন পতন ঘটেছিল আইয়ুব খানের, তার ব্যতিক্রম হয়নি ২৪ এ। ৬৯ এর একাদশ শ্রেণির মতিউর রহমান আর রিকশা চালক রুস্তম আলীর ইতিহাস যেন অচিরেই প্রাচীন করলো ২৪এর আবু সাইদ ও মীর মুগ্ধরা।

সেই বাল্যকাল থেকেই ঘরের চৌকাঠ আর রাস্তার দুপার্শ্ব জুড়ে দেখছি কোথাও নৌকা, কোথাও ধানের শীষের পোস্টার। ইসলাম নগরের দোকানপাটের কপাটগুলো যেন নৌকা ধানে সাজানো থাকতো। বুঝতামনা এর মানে। দিনশেষে ঘরে ফিরে আম্মুর কাছে এ ব্যপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচন"। সেই সময়ের দাঁতভাঙ্গা শব্দ নির্বাচনের ব্যাখ্যাকে খুঁজে, "ধুর বাবা বুঝিনা" বলে উড়িয়ে দিতাম বরং সে নির্বাচনী পোস্টার থেকে নৌকা ধানের শীষ কেটে নিয়ে কত খেলা করতাম।

কিছু অনুভূতি শুধু ২৪এর নয়। ধীরে ধীরে আকাশ ছোঁয়েছে। আক্ষেপের বৃক্ষ। কলম সৈনিকের কলমের অগ্রভাগ লিখতে না পারায় শুকিয়ে যাচ্ছিলো। 'জিহাদ বিল লিসানের' যোদ্ধাদের যেন নিগড়ের ঝনঝন শব্দ শুনা যাচ্ছিলো। গণতন্ত্রের মেশিনে যখন জ্বালানি হিসেবে বাংলার মানুষের তাজা রক্ত ব্যবহার হচ্ছিলো। সত্যবলা মানুষগুলোকে যখন মিথ্যা মামলা, গুম-খুন করা হচ্ছিলো ঠিক তখনই জেগে ওঠলো বাংলার সিংহ পুরুষরা। তারা সমাজের পাতিনেতা নয়। তারা ছিলো দেশপ্রেমিক বাংলার সন্তান। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ।

"মেধা কোটা" নিয়ে শুরু হয়েছিলো ২৪এর গণঅভ্যুত্থান। প্রথম দিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবী-দাওয়া থাকলেও পরবর্তীতে তা গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। জুলাই মাসের শুরুতে কোন এক অনুষ্ঠানে স্বৈরাচারী শাসকের বক্তব্য ছিল "মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এতো ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা চাকরি না পেয়ে রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে নাকি?" মধ্যরাতেই দাউদাউ করে আগুন জলে উঠলো ছাত্র জনতার হৃদয়ে। শুরু হলো বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। স্লোগান ধরলো "আমি কে

তুমি কে রাজাকার রাজাকার" স্লোগানে তাল হয়ে দাঁড়ালো বন্দুকের গুলি আর সাঁজোয়া যানের বিকট শব্দ। ধীরে ধীরে শহরের রাস্তাগুলো যেন লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে। আকাশে অগণিত খণ্ডে কালো ধোঁয়া জমা হচ্ছে বাংলার বুক থেকে। বাড়ি জ্বলছে, গাড়ি জ্বলছে ও জ্বলে যাচ্ছে বহু প্রাণ। এক পর্যায়ে তা আর ছাত্র আন্দোলন রইল না। ছাত্র বলো, শিক্ষক বলো, কৃষক বলো ও জেলে বলো সব পেশারই মানুষ নেমে পড়ল এক দফা এক দাবি নিয়ে রাজপথে। তা হলো স্বৈরাচারীর পতন। অবশেষে সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে গেলে ২৪ এর ৫ই আগস্ট পতন ঘটে স্বৈরাচারীর।

৫ই আগস্ট রোজ সোমবার, আমি বাসাতেই অবস্থান করছিলাম। দেশের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। কখন কি ঘটবে তার সংকেতও বোঝা যাচ্ছিল না। সারা দেশ জুড়ে চলছিল কারফিউ। রুম থেকেই সেনাবাহিনীর গাড়ির সংকেত শুনতাম। ঝুঁকিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও উঁকি মেরে দেখতাম। সোমবার জোহরের সালাতের পরে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়েছিলাম। দেশজুড়ে নেটওয়ার্ক সিস্টেম বন্ধ ছিল। খুব ঘুম পাচ্ছিল আমার। হঠাৎ করেই বাহির থেকে দল সুরে আওয়াজ এলো "পদত্যাগ করেছে পদত্যাগ করেছে" লাফিয়ে শোয়া থেকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাসায় কেউ না থাকা সত্ত্বেও উচ্চস্বরে বলে উঠলাম কে পদত্যাগ করেছে? দরজা খুলে রাস্তায় গেলাম। আকস্মিকভাবে ঢল নেমে এলো মানুষের। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম মেইন রোডের দিকে। লক্ষ্য করলাম আশেপাশে দালান বাড়িগুলোর ছাদে মানুষের জমায়েত। দীর্ঘদিনের বন্ধ জানালাগুলোও খুলে দিয়েছে। বেলকনি থেকে বৃদ্ধা-মহিলারাও দাঁড়িয়ে দেখছে রাস্তার মানুষের ঢল। আকাশটা কেমন জানি পরিষ্কার দেখাচ্ছে আজ।

আমার বাসার পাশেই ছিল বন্ধু সাখাওয়াতের বাড়ি। বন্ধু দৌড়ে আমার কাছে এলো। এসে বললো: বন্ধু চল! আজকে একটু ঘুরে আসি। অনেকদিন ধরে বাইরে বের হইনি। আমি বললাম চল, রাস্তায় রাস্তায় মানুষের আনন্দ মিছিল। ভিন্ন ভিন্ন সব দল এখন স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এক। নিজ নিজ দলের সমর্থকদের নিয়ে ট্রাকে করে ঘুরতেছে সব জায়গাতে। আমরা খানিকটা এগুতেই চলে এলো সেনাবাহিনীর গাড়ি। হাতে ছিল তাদের ফুলের তোড়া। বাংলার নাগরিকরা তাদের সংবর্ধনা জানাচ্ছিল। এখন তো রাষ্ট্রের ক্ষমতা পুরোপুরি সৈন্যদের কাছে। আরেকটু যখন এগিয়ে গেলাম, লক্ষ্য করলাম স্বৈরাচার শাসকগোষ্ঠীর লাগানো বড় বড় ব্যানার পোস্টার গুলো

মাটির সাথে ধুলিসাৎ করে ফেলেছে সবাই। সবাই সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। কেউ কাউকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। আমরাও খুব নিরিবিলি পথ দিয়ে মুক্ত বাতাসে হাঁটতে গিয়ে উপস্থিত হলাম এক তলিতে। বন্ধু বলে উঠলো "চল আমরাও মিষ্টি খাবো"। তলিতেই ছিল আরেক বন্ধু। তার ছিল মিষ্টির দোকান। দোকানে প্রবেশ করলাম। বললাম, বন্ধু মিষ্টি দাও তাড়াতাড়ি। সবাই মিলে মিষ্টি খেতে খেতে রাজনৈতিক গল্প করলাম কিছুক্ষণ। যদিওবা রাজনীতি সম্পর্কে তেমন ভালো ধারণা ছিল না কারো কাছে, তবে ভালো-মন্দ বিচারের যোগ্য ছিলাম সবাই। সেদিন শুধু বাংলার দু-এক জায়গাতেই নয়, সর্বত্র বাংলা জুড়ে চলছিল আনন্দ মিছিল।

এবার বাসায় ফিরে আসার পালা। হেঁটে গিয়েছিলাম ঠিকই , কিন্তু হেঁটে আসার কি সেই ইচ্ছা আর বাকি থাকে? হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ছিলাম। হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হল এক রিকশাওয়ালা মামা উচ্চস্বরে বলতে শুরু করলো "মামা আসেন, কই যাবেন?" আমরা তাড়াতাড়ি করে রিকশায় চড়ে বসলাম। রিক্সা ওয়ালা মামা দুঃখের সাথে বলতে লাগলো,"মামা বহুদিন ধরে রিকশা চালাইতে দেয় নাই, বউ-বাচ্চার খাওন কি তারা দিয়েছিল?" আজকে ক-টা পয়সা কড়ি পেলে তাদের ভালো করে খাওয়াবো। রিকশা থেকে দেখলাম ফুটপাতের সবজিওয়ালাটাও উচ্চস্বরে বলে উঠলো "এক গোছা দশ, এক গোছা দশ" নিয়ে যান। মুরগির দোকানের মুরগিগুলো ডানা ঝাপটাচ্ছে। রাস্তার পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ লোকটি সিগারেটের টান যেন পূর্বের চেয়ে লম্বা করেই দিচ্ছে। সবাই দীর্ঘ শ্বাস ফেলার সাথে স্বৈরাচারীর জুলুম নির্যাতনের ছোঁয়া গুলো মুছে ফেলতেছে। সরকারি অফিস আদালত থেকে স্বৈরাচারী শাসকের ছবিগুলো তুলে ফেলতেছে। এসব দেখতে দেখতে সূর্যাস্তের সময় হয়ে এলো। আমরাও বাসায় এসে পৌঁছলাম। বাসায় এসে চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম, মানুষদের আজকের আচরণ এমন কেন? উত্তর একটাই, আজ নিপীড়িত জনগণের উল্লাসের দিন। তাই মুখে বুকে চেপে রাখা আওয়াজগুলো উচ্চস্বরে বাইর করে দিচ্ছে। কেউ খুশি হয়ে হাসতেছে, কেউ খুশি মনে কাঁদতেছে। হ্যাঁ, এটা ছিল এক অনন্য বিজয়। এত স্বল্প সময়ে শহীদ গাজীর সংখ্যা হার মানিয়ে ছিল পূর্বের ইতিহাস কে।

—ভারত কেন বাংলার শত্রু

২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পরপরই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। আল্লাহর এই অশেষ

নিয়ামতের বারিধারা যেন জুলুমাতের বালিকণা গুলো ধুয়ে-মুছে চকচকে করে দিচ্ছে বাংলার জমিনকে। বহুকাল ধরেই বাংলার মাটি খুন-খারাবি ও রাহাজানিতে অপবিত্র হয়ে আছে। এ যেন স্বৈরাচারীর পতনের পর পবিত্রতার মাধ্যম। তবে বাংলার কিছু হুজোগে জাতিকে সত্যটা জানার সুবর্ণ সুযোগও করে দিয়েছেন রাব্বুল আলামিন। ২৪-এর বন্যার ব্যথাটা আমি ভিন্নভাবে তুলে ধরছি:

– বন্যায় নগর ভেলা
যাইদ আর মারুফ

দানব ডম্বুর তুলিয়া পর্দা,
বানাইলো বহু নগর ভেলা।
মুহুরী কহুয়া নয় মর্দা,
ভাসাইলো বসত অকাল বেলা।

ভাসে যুবক, তরণ, শিশু,
ভাসে বৃদ্ধা লোক।
কুলহারা আজ প্রাণী, পিশু,
হাসে ভয়ঙ্কর শোক।

মুক্ত হইলো রিযিক মৎস্য,
ডুবলো সোনার বীজতলা।
ভিজা হাতে মুছে কষ্ট,
অর্ধস্বরে বন্যার্তদের গলা।

ভোজন বিহীন লক্ষ্য প্রাণী,
করিতেছে স্নান অবিরত।
দাও, একমুঠো আহারখানি,
করো ম্লান অনাগত।

বাহ্যিক পর্দা ওপরে তুলে,
দেখছে কেউ সাঁতার খেলা।
বঙ্গ পড়িয়াছে ছলেবলে,
আজ বন্যায় নগর ভেলা।

২৪ শে বন্যার পর যদি কোন বাংলার সন্তান ভারতকে সোজা চোখে দেখে, তাহলে তাকে আমি জারজ বলে আখ্যায়িত করলাম। সে প্রাচীন ব্রিটিশ আমল থেকেই আমাদের অজানা নয় কোন কাহিনী। ভারত কেবল বাংলাদেশকে প্রয়োজনেই ব্যবহার করেছে। কোনদিন আমাদের বন্ধু ছিল না। ভারতকে নিয়ে এখন ব্যাখ্যা করার সময় নয়। এখন ভারতের আধিপত্য থেকে বাংলার জমিনকে মুক্ত করার সময়। দেশপ্রেমিক হলেই তা সম্ভব হবে। অন্যথায় পূর্বের ন্যায় গদি দখল করে দেশ চুষে খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। ইনশাআল্লাহ, বাংলার মানুষ পারেনা এমন কিছু নাই। বর্তমানে কারা দেশ চালাচ্ছে বা ভবিষ্যতে কারা দেশ চালাবে, তা নিয়ে বাংলার সাধারণ নাগরিকের মাথাব্যথা নাই। তবে একটি কথা সবারই স্মরণ রাখতে হবে, যে বা যারা ১৭বছর গদি ধরে ওম করেছে,

তাদের গদি থেকে নামাতে ১৭ ঘণ্টাও সময় লাগেনি। ভবিষ্যতেও পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশকে ছলে ফেলার প্রচেষ্টা চালালে তাকেও গদি থেকে নামাতে ১৭সেকেন্ডও সময় লাগবে না, ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না।

দেশপ্রেমিক হও বঙ্গমায়ের সন্তান,
তুমিই তো বঙ্গের প্রাণ।
স্বার্থপরের মঞ্চে আর যদি গাও গান,
নিজেই করবে নিজের লোকসান।

আজকের কলম এখানেই বন্ধ করলাম। পৃথিবীতে যতদিন বাঁচবো সমুদ্রের পানিকে কলমের কালি বানাবো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা লিখে যাবো। ইনশাআল্লাহ।

نصر من الله وفتح قريب وما
توفيقي الا بالله

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

বিজয়ের হাসি

আজ সোমবার। ৫ই আগস্ট। সারা দেশে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। পহেলা জুলাই থেকে শুরু হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। সারা দেশের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে। সময়ের সাথে সাথে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এদিকে শিক্ষার্থীদের প্রতিহত করতে স্বৈরাচারী সরকারের আদেশে রাস্তায় নেমে আসে নামমাত্র আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। তাদের হাতে নিহত হয় জানা-অজানা কত মাসুম প্রাণ। আহত হয় শতাধিক মানুষ। কিন্তু আচমকা ঘটে যায় এক অমর কাহিনি। যা দেশ ও দেশের মানুষ কখনোই ভুলবে না। গত ১৬ই জুলাই একদল নামমাত্র পুলিশের সামনে নিজের সাহসভরা বুক পেতে বীরের পরিচয় দেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। নির্দয় পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয় সে। আবু সাঈদ শহিদ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের উপর তার বিষণ প্রভাব পড়ে। জালিম সরকার পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে জরুরি অবস্থা জারি করে। কিন্তু এতেও কোনো কাজ হয় না। শিক্ষার্থীরা তখনও চারিদিকে আন্দলোন চালিয়েই যাচ্ছিল। তাদের সাথে এসে যোগ দিলো রিকশাওয়ালা, দিনমজুর ও ড্রাইভারসহ সর্বস্তরের শ্রেণিপেশার মানুষ। দেখতে দেখতে সময় জুলাই পেরিয়ে আগস্টে চলে এলো। আজকের এই দিনটি ছিল বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে আনন্দের দিন। আমি তো আর বাংলা কবি নজরুল নই, তাই আনন্দ চিত্রের পূর্ণরূপটা তুলে ধরতে পারলাম না। শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, সকলের মুখেই ছিল বিজয়ের হাসি। যেটা ছিল হাকিকি বিজয়। যার বিনিময় শুধু রক্ত হয়। স্বৈরাচারী শাসক দেশ ছেড়ে পালালো। জাতি উল্লাসে মেতে উঠল। এদিকে আমাদের মাদ্রাসায় চলছে পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতি। সারাদিন কেটে গেল পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে। বিকেলে আসরের পূর্বে জানতে পারলাম শায়খ হাসিনা ও সরি, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। খুশিতে বুকটা ভরে গেল। এই আনন্দের পেছনে যে কত আত্যত্যাগ রয়েছে, তা করোরেই অজানা নয়। শেষ বিকেলে আকাশপ্রাণে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যা ছিল লাখো মাজলুমের মধ্যে হতে কোনো একজনের কিঞ্চিৎ অনুভূতি। ঠিক তখন মনে উদিত হলো,

لكل فرعون موسى.

তৌহিদুর রহমান
লেখক

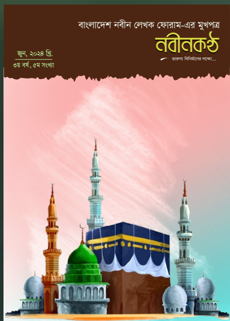

লেখক পুরস্কার

মাসিক নবীনকণ্ঠ'র জুন-২০২৪ সংখ্যায় যারা
'সেরা লেখক' নির্বাচিত হয়েছেন:

১
উবাইদুল্লাহ তারানগরী
প্রবন্ধ

২
সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
ছড়া

৩
তপন মাইতি
কবিতা

৪
আমাতুল্লাহ ফাতেমা
গল্প

নির্বাচিত লেখকবৃন্দকে নবীনকণ্ঠ'র ফেসবুক পেইজের ইনবক্সে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

নবীনকণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মানের লক্ষ্যে...

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম
(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. প্রকাশনী
(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com
যোগাযোগ: 01789204674